দ্বৈরথ

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. বাথরুমের দরজা খোলা 3

২. টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে....................18

৩. লোকটার নাম কামাল....................34

৪. সোমার শোবার জায়গা 50

৫. ঊর্মির ঘরে নতুন ফ্যান....................57

৬. কামালের চোখের অবস্থা খুব খারাপ 89

৭. সোমার কেমন যেন শীত শীত লাগছে....................91

৮. দোতলা বাড়িটা আগের মতোই আছে....................96

৯. খাটের নিচে মিউ-মিউ শব্দ 101

১০. সন্ধ্যাবেলা সোমা চা বানাচ্ছিল....................108

১১. ছদরুদ্দিন সাহেব খাটে আধশোয়া হয়ে বসা....................114

১২. প্যাকেট করা নতুন ক্যাসেট 120

১৩. বিজু মুরাদকে ধরে এনেছে....................126

১৪. বড় চাচাকে নিয়ে যেতে 144
১৫. সোমা নতুন বই নিতে এসেছে 148
১৬. সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে 152

১. বাথরুমের দরজা খোলা

বাথরুমের দরজা খোলা। লোকা অনেকক্ষণ ধরে বাথরুমে। বিশ্রী রকমের একটা আওয়াজ আসছে। গঁরল-গঁল-গঁরল। একজন মানুষ এমন কুৎসিত শব্দে গার্গল করে কিভাবে? সুন্দর শোভন কিছুই কি মানুষটার নেই?

সোমা হাই তুলল। মাত্র নটা বাজে। এর মধ্যে হাই ওঠার কথা না। কিন্তু এই মানুষটি আশেপাশে থাকলে তার হাই ওঠে। লোকটি অবশ্য বুঝতে পারে না। তাই ওঠার সঙ্গে যে অবহেলার একটা ব্যাপার আছে, তা বোধহয় সে জানেও না। জানলেও তার হয়তো কিছু যায় আসে না।

সোমা।

লোকটার গলার স্বর অবশ্যি মিষ্টি। না, মিষ্টি বলাটা ঠিক হচ্ছে না। পুরুষদের গলা মিষ্টি হয় না। ধাতব একটা ঝংকার শুধু থাকে। এই লোকের তা আছে। শুনতে ভালো লাগে। কথা শুনলে জবাব দিতে ইচ্ছে করে।

এই সোমা।

আসছি।

একটু লবণ দাও।

লবণ দিয়ে কী করবে?

দাঁত ঘষব। শালা দাঁতে পেইন উঠেছে।

সোমা লবণ আনতে গেল। তার কানে ঝনঝন করে বাজছে—দাঁত ঘষব। শালা দাঁতে পেইন উঠেছে। লোটা কি ইচ্ছে করলে শালা শব্দটা বাদ দিতে পারত না? বোধহয় না। এইসব শব্দ তার রক্তে মিশে আছে। এই ঘরে একটা সাদা রঙের বিড়াল আসে। বিড়ালটার একটা চোখ নষ্ট। তাই সে বিড়ালটাকে ডাকে কানাশালি। বিড়ালটাকে শালি না ডাকলে কি চলত না?

সোমা ঝকঝকে একটা পিরিচের ঠিক মাঝখানে খানিকটা লবণ নিল। কিছু ছড়িয়ে গিয়েছিল সাবধানে সে একত্র করল। অসুন্দর কোনকিছুই তার ভালো লাগে না। যদিও তাকে বাস করতে হয় অসুন্দরের মধ্যে।

লোকটা তার হাত থেকে পিরিচ নিল। লবণ কত সুন্দর করে সাজানো সেদিকে সে লক্ষও করছে না। আঙুলে লবণ নিয়ে বিকট ভঙ্গিতে দাঁত ঘষছে। মাঝে-মাঝে থুথু করে থুথু ফেলছে। সোমা বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়িয়ে না থাকলেও চলত, তবুও সে দাঁড়িয়ে আছে। কেন আছে লোকটা কি তা জানে? মনে হয় জানে না।

সোমা।

বল।

শালার রক্ত পড়ছে। মাঢ়ী নষ্ট হয়ে গেছে। নিমের ডাল জোগাড় করতে হবে। টুথপেস্ট ফুপেস্ট দাঁতের বারটা বাজিয়ে দেয়।

কিছু বলবে না বলবে না করেও সোমা বলল, নিমের ডাল কোথায় পাবে?

আছে সবই আছে। ঢাকা শহরে সব আছে। শালার ইন্টারেস্টিং একটা শহর। ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ভাত বাড়ব?

বাড়। মিনু হারামজাদী কোথায়?

ঘুনুচ্ছে।

নয়টা বাজতেই ঘুম-হারামজাদী পেয়েছে কী? মাসে সত্তর টাকা দিই ওর মুখ দেখার জন্য? কানে ধরে তোল। এগারটার আগে ঘুমাতে দেখলে থাপ্পড় দিয়ে হারামজাদীর দাঁত ফেলে দেব।

ওর জ্বর। আমি ভাত বাড়ছি—অসুবিধা তো কিছু নেই।

অসুবিধা থাকুক আর না থাকুক, নটার সময় ঘুমাবে কেন? ফাজিলের ফাজিল।

সোমা রান্না ঘরে চলে গেল। খাবার গরম করল। কেটলিতে চায়ের পানি চড়িয়ে দিল। খাওয়াদাওয়ার পর তোকটা এক কাপ চা খায়। আদা দিয়ে কড়া এক কাপ চা। এতে নাকি

পিত্ত পরিষ্কার হয়। আজ খাওয়ার আয়োজন ভালো না। ছোট মাছের তরকারি, আলু ভাজা এবং ডাল। মুগের ডাল। লোটার খুব প্রিয় জিনিস। হুসহুস শব্দ করে ডাল খাবে। চোখ চকচক করতে থাকবে। খাবার সময় বেশ কয়েকবার বলবেলো হয়েছে। গুড কুকিং। এক নম্বরি ডাল।

তারা খেতে বসতে বসতে দশটা বেজে গেল। বারান্দায় টেবিল। দুজনে বসেছে। মুখোমুখি। লোকটা প্লেটে ডাল নিতে নিতে বলল, মুগের ডাল না-কি?

সোমা জবাব দিল না। লোকটা হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। ডালের গন্ধটা ফাইন। মনে হচ্ছে গুড কুকিং হয়েছে। ডাল ভেজে নিয়েছিলে?

হুঁ।

গুড। ভেরি গুড। মুগের ডালের আসল রহস্য ভাজার মধ্যে। অল্প ভাজাও যাবে না, আবার বেশিও ভাজা যাবে না। ডিফিকাল্ট। খুব ডিফিকাল্ট।

সাদা বিড়ালটা চলে এসেছে। লোকটার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। খামচি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। খেতে না দেওয়া পর্যন্ত এরকম করতেই থাকবে। মাঝে-মাঝে কামড়ও দেবে।

সোমা।

বল। কানাশালির আবার পেট হয়েছে—দেখছ? শালি ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। প্রতি তিন মাসে এক বার করে পেট। অবস্থাটা চিন্তা কর। শালি মনে হচ্ছে বিরাট প্রেমিকা।

সোমা মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো শুনতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় নেই। শুনতেই হবে। অসুন্দর কোনো দৃশ্য দেখতে না চাইলে আমরা চোখ বন্ধ করতে পারি। কান বন্ধ করার কোন উপায় নেই।

সোমা।

বল।

শালির লাইগেশন করিয়ে দিলে কেমন হয়? ফুর্তি করে বেড়াবে। পেট হবে না। ফাইন ব্যবস্থা। বিড়ালেরও লাইগেশন হয়। তুমি জান?

জানি না।

হয়। খোঁজ নিয়েছি। বদরুল সায়েবের এক শালা পশু হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। তার কাছে শুনলাম। শালিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাব। কষ্টটা দেখ না, তিন মাস পর-পর-ডালটা ভালো হয়েছে। গুড কুকিং।

সোমা জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেই।

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, বিড়াল জানোয়ার ভালো। ফুর্তিফার্তা যা করে মানুষের আড়ালে করে, আর কুকুরের অবস্থাটা দেখ–

সোমা ভাবল লোকটাকে কঠিন কিছু বলবে। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। থাক আজ আর বলে কি হবে? কোনো দরকার নেই। সোমা উঠে পড়ল। লোটা বিস্মিত হয়ে বলল, খাওয়া হয়ে গেল?

হুঁ।

একটা বাটিতে করে শালিকে খানিকটা দুধ খেতে দাও। এখন শালির ভালো মন্দ খাওয়া দরকার। ডালটা ভালো হয়েছে সোমা। গুড কুকিং।

সোমা বাটিতে করে বেশ খানিকটা দুধ বিড়ালটাকে এনে দিল। বিড়ালটা জিত ভিজিয়ে ভিজিয়ে দুধ খাচ্ছে আবার ফিরে যাচ্ছে লোকটার পায়ের কাছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার ফিরে আসছে বাটির কাছে। সোমার কাছে এক বারও আসছে না। বিড়ালরাও অনেক কিছু বুঝতে পারে।

সোমা।

বল।

শালিকে এখন থেকে রোজ খানিকটা দুধ দেবে। এই সময় খাওয়াটা ভালো দরকার। তিন মাস পরপর পেট হয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থা দেখা

লোকটা শব্দ করে ঢেকুর তুলল। বাটিতে সামান্য যা ডাল ছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। গোঁফে হলুদ রঙের ছোপ। সোমা এক বার ভাবল, বলবে গোঁফে ডাল লেগেছে। শেষ পর্যন্ত আর বলল না।

চা দাও সোমা, খাওয়া হয়ে গেছে। আজকের মতো একসেলেন্ট ডাল অনেক দিন খাওয়া হয় নি। মাছের একটা মাথা যদি দিতে পারতে তা হলে দেখতে কি জিনিস হত।

সোমা চা দিতে এসে দেখে লোকটা মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। বিড়ালের দুধ খাওয়া দেখছে। এখন হাত দেয়া হয় নি। ডাল শুকিয়ে হলুদ দাগ পড়েছে।

চা নাও।

শালির দুধ খাওয়ার কায়দাটা দেখেছ? কেমন ঘুরে ঘুরে খায়। অদ্ভুত কাণ্ড।

সোমা দাঁড়িয়ে রইল। সে বিড়ালের দুধ খাওয়া দেখছে না। লোকটাকে দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাকে সে অত্যন্ত কঠিন কিছু কথা বলবে। কঠিন কথাগুলো শুনে সে কি করবে কে জানে, চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলবে? চিৎকার চেঁচামেচি করবে? গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? কিছুই বলা যাচ্ছে না। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা মানুষ কেমন আচরণ করে তা বলা খুবই কঠিন।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

শালি কেমন ঘুরে ঘুরে দুধ খায় দেখেছ? ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং।

সোমা সহজ স্বাভাবিক, স্বরে বলল, হাত-মুখ ধুয়ে তুমি বসার ঘরে একটু আসবে? তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে।

লোকটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কি কিছু আঁচ করতে পারছে? মনে হয় না। আঁচ করতে পারলে থমথমে গলায় বলত কি জরুরি কথা? সে কিছুই না বলে বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে ঢুকল। বাথরুম থেকেই চেচিয়ে বলল, চা খাব না। একটা পান দাও।

সোমাদের বসার ঘরটা ছোট। এই ছোট ঘরের একটা অংশে মিনু শুয়ে আছে। বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে। জ্বর বেড়েছে বোধহয়। অন্য সময় হলে সোমা মেয়েটার জ্বর দেখত। ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করত। আজ তা করল না। জরুরি কথাগুলো শেষ হোক। তারপর যদি সুযোগ হয় তখন দেখা যাবে।

বসার ঘরে চারটা বেতের চেয়ার। মাঝখানে গোল টেবিলে ধবধবে সাদা টেবিল কথ। টেবিল ক্লথের ঠিক মাঝখানে লাল রঙা পিরিচে পান। সাদা, লাল এবং সবুজ রঙ কি সুন্দর লাগছে।

লোকটা সোমার সামনের চেয়ারে বসল। তার চোখ লালচে। রাতের বেলা তার চোখ লালচে হয়ে থাকে। ভোরবেলা আবার সাদা হয়ে যায়। বাঁ চোখ অবশ্যি সাদা হয় না। লালচে আভা খানিকটা থেকেই যায়। ছোট বেলায় নাকি বাঁ চোখে চোট খেয়েছিল।

পান দাও।

লোকটা পান নিতে নিতে কঠিন চোখে তিন চার বার তাকাল। আজ তার চোখ অন্য দিনের চেয়েও লাল মনে হচ্ছে। না-কি এটা সোমার মনের ভুল?

সোমা!

বল।

তোমার কোনো জরুরি কথা বলার দরকার নেই। জরুরি কথা আমি জানি। বিজু এসেছিল—ও সব কথা বলল।

কখন এসেছিল?

দুপুরের দিকে রহমতের চায়ের স্টলে।

রহমতের চায়ের স্টলে লোকটা রোজ এক বার যায়। দুপুরের দিকেই যায়। ঐ স্টলে তার শেয়ার আছে কিন্তু বিজুর তো তা জানার কথা না। জানল কি করে?

সোমা পান খায় না। তখন একটা মুখে দিল। জর্দা দেওয়া পান। পানের কষটা পিকে মুখ ভরে যাচ্ছে। মাথা ঝিম্ ঝিম করছে। জর্দার রসে মুখ ভর্তি হয়ে আসছে। ফেলার উপায় নেই। ফেলতে হলে উঠে যেতে হবে। এখন ওঠা সম্ভব না।

বিজু যা করছে বলার না। চেঁচামেচি হৈ চৈ। আমি বললাম, ভদ্রলোকের ছেলে চেঁচাচ্ছ কেন? এতে তার রাগ আরো বেড়ে গেল। লোকজনের সামনে ইতর ছোটলোক, জেলের ঘুঘু এইসব বলেছে।

সোমা বিব্রত স্বরে বলল, বিজুর মাথা সবসময় গরম। ওকে কেউ তোমার কাছে। যেতে বলে নি। নিজে নিজেই গিয়েছে।

গিয়েই ভালো করেছে। না গেলে জানতাম যে তুমি আজ ডিভোর্স পেয়ে বসে আছ? বিজুর কারণে জানলাম।

তুমি তো জানতে যে আমি ডিভোর্স চেয়ে চিঠি দিয়েছি। জানতে না?

হ্যাঁ জানতাম। ব্যাপারগুলো এত তাড়াতাড়ি হয় জানতাম না। এক বার কোর্টে যেতে হল না, কিছু না–হঠাৎ শুনি ডিভোর্স।

এইসব কেইস কোর্টে যায় না।

তাইতো দেখছি। ব্যাপারটা এত সহজ আমি জানতাম না।

জানলে কী করতে?

করতাম আর কি? করার কি আছে?

বিজু কি খুব হৈ চৈ করেছিল?

করেছিল মানে? দেখার মতো একটা দৃশ্য। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি বলে কি-তুই জেলের ঘুঘু, চামারের চামার। জেল যখন খেটেছি জেলের ঘুঘু তো বলবেই।

তুই তোকারি কেন?

ওর মাথা গরম।

মাথা আমারও গরম। আমার কি মাথা ঠাণ্ডা? মাথা ঠাণ্ডা হলে চার বছর জেল। খেটে আসি? ঠাণ্ডা মাথায় কটা লোক জেলের ভাত খায়?

তোমার মাথা অনেক ঠাণ্ডা।

সমাজে চলতে ফিরতে হয় এই জন্যে ঠাণ্ডা রাখি। আসলে ঠাণ্ডা না। তুমি এতসব ঝামেলা না করে আমাকে গুছিয়ে বললেই হত।

বললেই তুমি আমাকে চলে যেতে দিতে?

যে থাকতে না চায় তাকে ধরে রাখা যায়? আমার কি জেলখানা আছে যে তোমাকে জেলখানায় আটকে রাখব?

সোমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, কাগজপত্র দেখতে চাও?

কাগজ দেখে কি হবে?

কিছু হবে না, তবু যদি দেখতে চাও।

দূর দূর।

লোকটা হাই তুলল। কী আশ্চর্য! এই অবস্থায় কেউ হাই তুলতে পারে? সত্যি সত্যি কি লোকটার ঘুম আসছে? নাকি সে ভান করছে। না, ভান নিশ্চয়ই করছে না। লোকটা ভান করতে পারে না। আচ্ছা এই লোক কি নির্বোধ? কারণ একমাত্র নির্বোধরাই ভান করতে পারে না। সাদা বিড়ালটা এসে লোকটার পায়ে গা ঘষছে। আঙুল কামড়ে ধরছে। বড় ঝামেলা করছে। মাঝে মাঝে বিড়ালটা খুব বিরক্ত করে—তখন লাথি খায়। আজও নিশ্চয়ই লাথি খাবে। কিংবা কে জানে হয়তো লাথি খাবে না। আজকের রাতটা আর অন্য দশটা রাতের মতো নয়। লোকটি আবার হাই তুলল; চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লাথির ভয়েই হয়তো বিড়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল।

সোমা।

বল।

কাল কখন যাবে?

দশটা এগারটার দিকে।

ও আচ্ছা। আমি আটটার সময় চলে যাব। নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে। ঘুম ভাঙলে হয়। শালার ঘুম ভাঙে না।

আমি সাতটার সময় ডেকে দেব।

নাশতা-টাশতার হাঙ্গামা করার দরকার নেই। চা খেয়ে চলে যাব। যাও ঘুমুতে যাও।

লোকটা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শোবার ঘরে চলে গেল। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তার কোন ছাপ তার আচার আচরণে নেই। যেন আজকের রাতটা অন্য আর দশটা রাতের মতোই। যেন সোমার সঙ্গে সামান্য কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে এবং মিটমাটও হয়ে গেছে। শাবার ঘর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। লোকটা দিনের শেষ সিগারেটটা ধরিয়েছে। খুক খুক করে কাশছে। সোমা সামনে থাকলে নির্ঘাত বলত শালার সিগারেট। ধরা যায় না ছাড়াও যায় না। সিগারেট শেষ করে সে একটা কাঁচা রসুন খাবে। পুরোটা খেতে পারবে না। খানিকটা খেয়েই মুখ বিকৃত করবে। বিড় বিড় করে রসুনকে খানিকক্ষণ গালাগালি করবে।

সোমা চায়ের কাপ নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। সব ধুয়ে রেখে যাবে। ময়লা অপরিচ্ছন্ন কিছু যেন না থাকে। রান্না ঘরটার জন্যে মায়া লাগছে। কেন লাগছে কে জানে।

সোমা।

সোমা শোয়ার ঘরে ঢুকল। লোকটা পা তুলে বুড়ো মানুষের মতো চেয়ারে বসে আছে। সিগারেট ফেলে দিয়েছে। পুরোটা খেতে পারে নি। ্কখনো পারে না।

সোমা।

বল।

অনেক দুঃখ কষ্ট তোমাকে দিয়েছি, কিছু মনে রেখ না। মনের মধ্যে রাগ রাখা ঠিক না। স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়।

তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।

আমারও নেই।

সোমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমি চলে যাব ভেবে তোমার কি খারাপ লাগছে?

না। তেল আর পানি কোনদিন মেশে না এটা ঠিক নামেশে, তবে খুব ঝাঁকাঝাঁকি করতে হয়। আমার ঝাঁকাঝাঁকি করতে ভালো লাগে না।

সোমা তাকিয়ে রইল। লোকা মাঝে মাঝে মজার কথা বলে। ফিলসফারের মতো কথা। সব মানুষের মধ্যেই বোধহয় একজন ফিলসফার থাকে। লোকটা চেয়ার থেকে নেমে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল। নিচু গলায় বলল, ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সারা দিন অনেক ধকল গিয়েছে। বিজুর মাথাটা এরকম গরম হল কেন বল তো? বিপদে পড়বে তো। দিনকাল খারাপ।

তুমি আজ রসুন খেলে না?

বাদ দাও শরীরটা ভালোনা। রসুন খেতে গেলে বমি হয়ে যাবে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।

সোমা বাতি নিবিয়ে দিল। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হল না। পাশের ঘর থেকে আলো আসছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। সোমা বলল, টাকা পয়সা সব স্টিলের আমিরায় আছে। চাবি টেবিলের ড্রয়ারে।

লোকটা কোনো উত্তর দিল না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সোমা বারান্দার বাতি নিবিয়ে দিল। অনেক দিন আর এই বারান্দায় আসা হবে না। আটটা ফুলের টব বারান্দায় সাজানো, দুটোতে আছে বকমভিলিয়া। টবে না-কি বকমভিলিয়া হয় না, তবু সে পরীক্ষা করার জন্যে লাগিয়েছে। দুটো গাছ বড় হয়েছে, এখনো পাতা ছাড়ে নি। কি রঙের পাতা ছাড়বে কে জানে। কাল এই টব দুটো সঙ্গে নিয়ে যাবে? না থাক। এ বাড়ির কিছুই সে নেবে না। এসেছিল খালি হাতে, ফিরেও যাবে খালি হাতে।

সোমা বসার ঘরে ঢুকল। বিড়ালটা আবার ফিরে এসেছে। লোকা যে চেয়ারে বসেছিল বিড়ালটাও ঠিক সেই চেয়ারে বসেছে। এক চোখে তাকিয়ে আছে সোমার দিকে। সোমা বিড়ালের সামনের চেয়ারে বসল। সে সারা রাত জাগবে। নিশি যাপনের জন্যে একজন সঙ্গী দরকার। পাশের ঘর থেকে লোকটার নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ আসছে। চারদিকে সুনসা নীরবতা। সোমা জেগে আছে। বিড়ালটাও জেগে আছে। এক চোখে আগ্রহ নিয়ে দেখছে সোমাকে। এই বাড়ি ছেড়ে কাল ভোরে সে চলে যাবে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, অথচ এজন্যে তার তেমন খারাপ লাগছে না। একটু খারাপ লাগা উচিত ছিল। কেন লাগছে না কে জানে।

২. টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। মেঘের রঙ ক্রমেই কালো হচ্ছে। মনে হচ্ছে সারা দিনই বৃষ্টি হবে। পর্দা ঢাকা রিকশা, তবু সোমা অনেকখানি ভিজে গেছে। খুব বিরক্ত লাগছে। ভেজা শাড়ি গায়ে লেপ্টে থাকবে আর সে নামবে রিকশা থেকে।

রাস্তা ভালো নাখানাখন্দ। একেক বার এমন ঝাঁকুনি খাচ্ছে মনে হচ্ছে সোমা উলটে পড়ে যাবে। সে কড়া গলায় বলল, আস্তে চালান না ভাই। মেয়েরা আস্তে চালাতে বললে রিকশাওয়ালারা সাধারণত খুব দ্রুত চালাতে শুরু করে। এখানেও তাই হল রিকশা চলল ঝড়ের গতিতে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে সবকিছু নিয়ে রিকশা উলটে পড়বে। দ্বিতীয় বার রিকশাওয়ালাকে আস্তে চালানোর অনুরোধ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। হোক একটা অ্যাকসিডেন্ট। সোমার ভাগ্যে অ্যাকসিডেন্ট যোগ আছে। ওর পঁচিশ বছরের জীবনে তিন বার সে রিকশা নিয়ে উলটে পড়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার কোনো বারই তার নিজের কিছু হয় নি। গায়ে সামান্য আচড়ও লাগে নি। অথচ রিকশাওয়ালা প্রতি বারই জখম হয়েছে। এক বার তো এক জন একেবারে মর মর। হাসপাতালে ছিল অনেক দিন। সোমা দুবার দেখতে গিয়েছে। রিকশাওয়ালার স্ত্রী খাটের কাছে বসে থাকত। সোমাকে দেখলেই বাঘিনীর মতো তাকাত, যেন সমস্ত দোষ সোমার।

আফা কোন বাড়ি?

পরের গলিটা দিয়ে ঢেকেন। সাবধানে যাবেন রাস্তা ভাঙা।

ভাঙা রাস্তায় সাবধানে গাড়ি চালাইলে অ্যাকসিডেন্ট বেশি হয় আফা।

বেশ তা হলে অসাবধান হয়েই চালান।

ঝিকাতলার এই বাড়ির অর্ধেক সোমাদের। সোমার দাদা গ্রামের সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে ঢাকা শহরে দুতলা বাড়ি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুই ছেলে বাড়ি পেয়ে গেল। দুজনেই মোটামুটিভাবে অপদার্থ। সোমার বাবা সাইফুদ্দিন সাহেব এল এম এফ ডাক্তার। দীর্ঘ দিনেও তাঁর কোনো পসার হল না। সারা দিন ডিসপেনসারিতে বসে থাকেন, একটা রুগী আসে না। এক ডিসপেনসারির মালিক তো এক দিন বলেই বসল, আপনি ভাই অপয়া মানুষ। অন্য কোথাও গিয়ে বসেন। ডাক্তারের কাছে রুগী না এলে ওষুধপত্র বিক্রি হয় না। বুঝলেন না?

সোমার বড় চাচা ছদরুদ্দিন সাহেবও একই পদের মানুষ। তাঁর কাজ হচ্ছে টাকা ফাটকা ব্যবসা করা এবং বড় বড় কথা বলা। গা জ্বলে যাবার মতো কথা। তাঁর কথা যেই শোনে তারই গা জ্বলে যায়—তিনি বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

বাড়ির একতলা পেল সোমারা, দোতলা পেলেন ছদরুদ্দিন সাহেব। ছদরুদ্দিন সাহেবের ধারণা তিনি ক্যাপিটালের অভাবে বড়কিছু করতে পারছেন না। একটা বড় রকমের ক্যাপিটাল পেলেই ভেলকি দেখিয়ে দেবেন। ভেলকি দেখাবার আশাতে তিনি তাঁর নিজের অংশ বিক্রি করে দিলেন। ছোট ভাইকে বললেন, এক মাসের মামলা, এক মাসের মধ্যে দুতলা কিনে নেব। টাকা কিছু বেশি দিতে হবে। উপায় কি। এই এক মাস তোর সঙ্গে থাকব। তবে মাগনা থাকব মনে করি না। পুরো রেন্ট পাবি। হা-হা-হা। নিজের ভাই বলে যে বাড়তি সুযোগ নেব, আমি এই রকম মানুষই না।

এক মাসের জন্যে এসেছিলেন এখন দশ বছর হয়েছে। এক তলার অর্ধেকটা ছদরুদ্দিন সাহেবের দখলে। এখনো তিনি টুটকা ফাটকা ব্যবসা করেন। এবংসারাক্ষণই আক্ষেপ করেন যে, ক্যাপিটালের অভাবে কিছু করতে পারছেন না। বছর দুই ধরে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ—শুধু ছোট ভাই নয়, ছোট ভাইয়ের পরিবারের কারোর সঙ্গেই তিনি কথা বলেন না। কয়েক দিন আগে প্রথম নাতনির জন্ম হল—এ বাড়ির কাউকে বলা হয় নি।

সোমা রিকশা থেকে নেমেই তার বড় চাচার মুখোমুখি হয়ে গেল। ছদরুদ্দিন সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির সামনের কড়ই গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সামনে দড়ি হাতে একটা শুকনো ধরনের লোক। লোকটার সঙ্গে নিচু গলায় কি সব কথাবার্তা হচ্ছে। সোমা স্যুটকেস হাতে এগিয়ে গেল। বড় চাচার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন চাচা?

ভালো আছি। তুই কোত্থেকে?

সোমা তার জবাব না দিয়ে চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করল। ছদরুদ্দিন প্রসন্ন গলায় বললেন, বাড়িতে আসলেই সালাম করতে হবে না-কি? যা যা ভেতরে যা।

আপনি এই বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন?

গাছ কাটাচ্ছি। আট হাজার টাকায় এই গাছ বেচলাম।

গাছের দাম এত?

মানুষের চেয়ে গাছের দাম বেশিরে মা। এমনও গাছ আছে যার দাম লাখ টাকা। লাখ টাকা দামের মানুষ কটা আছে বল দেখিঃ হাতে গোনা যায়। যা ভেতরে যা।

সোমা দরজায় কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে ঊর্মি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে? যেন ধমক দিচ্ছে। সতের আঠার বছরের কোনো মেয়ে এরকম ধমকের গলায় কথা বলে না-কি? সোমা নরম গলায় বলল, ঊর্মি, দরজা খোল। আমি।

ঊর্মি দরজা খুলল, খুশি-খুশি গলায় বলল, আপা তুমি চলে এসেছ। বাবা আর বিজু ভাইয়া এই কিছুক্ষণ আগে তোমাকে আনতে গেল। বিজু ভাইয়া তোমার জন্যে একটা জিপ জোগাড় করেছে।

আমি বুঝি জিপ ছাড়া চলাফেরা করি না?

জিনিসপত্র থাকবে সঙ্গে এই জন্যে।

জিনিসপত্র থাকবে কেন? জিনিসপত্র আমি পাব কোথায়? জিপ যাবে জানলে অবশ্যি ফুলের টব দুটো নিয়ে আসতাম। মা কই রে?

রান্নাঘরে নাশতা বানাচ্ছে। এখনো কারো নাশতা হয় নি। তুমি এলে একসঙ্গে হবে।

একটা শুকনো গামছা দে তো গোসল করব। ঘরে গায়ে-মাখা সাবান আছে?

জানি না। থাকলে বাথরুমে আছে। তবে খুব সম্ভব নেই। এ-বাড়ির নিয়ম হল যখন যে জিনিস চাইবে সে জিনিস থাকবে না।

সোমার মা এককালে খুব রূপবতী ছিলেন। তাঁর কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে। এককালে শান্ত এবং মৃদুভাষী ছিলেন, এখন তার কিছুই নেই। অল্পতেই রেগে যান। রেগে গেলে অনর্গল কথা বলেন। কথা বলার এক পর্যায়ে কাজের ছেলেটি মার খায়। সহজ মার না, হিংস্র ধরনের মার। এক কালের শান্ত, মৃদুভাষী এবং রূপবতী এক জন। মহিলা যে এতটা হিংস্র হতে পারেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

হিংস্রতার পর্ব কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। খুন্তির হাতল দিয়ে মনের সুখে কাজের ছেলেটিকে পিটিয়ে এখন তিনি খানিকটা ক্লান্ত। কাজের ছেলেটির বয়স নয়-দশ। নাম মুরাদ। তার ব্যথা-বোধ তেমন তীব্র নয় বলে মনে হচ্ছে। খুন্তির হাতার দাগ তার সারা গায়ে কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সে মোটামুটি নির্বিকার ভঙ্গিতেই রুটি বেলছে। মাঝে-মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। জাহানারা খুন্তি উঠিয়ে বলছেন, খবরদার-শব্দ করলে মেরে ফেলব।

ঊর্মি রান্নাঘরে ঢুকে হাসিমুখে বলল, বড় আপা একা-একা চলে এসেছে।

জাহানারা বিরস গলায় বললেন, কান্নাকাটি করছে না-কি?

না।

এখানে আসতে বল। গোসল করছে।

এসেই গোসল, বালতির পানি সব শেষ না করে তা রেরুবে না। বলে দে, পানি যেন সাবধানে খরচ করে।

থাক মা কিছু বলার দরকার নেই। মুরাদকে মেরেছ নাকি?

জাহানারা কিছু বললেন না।

ইস কি অবস্থা করেছ। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে তো মা।

জাহানারা তিক্ত গলায় বললেন, যা তুই কোলে নিয়ে আদর কর।

ঊর্মি আর কিছু বলল না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। নরম গলায় ডাকল, আপা।

কি রে?

সাবান পেয়েছ?

হুঁ।

পানি কিন্তু সাবধানে খরচ করতে হবে। পানির খুব টানাটানি।

আগে বললি না কেন? শেষ করে ফেলেছি তো।

শেষ করলে করেছ।

সোমা মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বের হয়ে এল। রাতের অঘুমের ক্লান্তি মুছে গেছে। তার সারা মুখে একটা স্নিগ্ধ ভাব।

ঊর্মি হাসিমুখে বলল, তুমি আর একটু ফর্সা হলে খুব সুন্দর লাগত।

এখন অসুন্দর লাগে?

না, এখনো সুন্দর।

বিজুরা এখনো ফেরে নি?

না–যত দেরিতে ফেরে ততই ভালো। কেন?

ফিরলেই প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হবে। বড় চাচা কাউকে কিছু না বলে চার হাজার টাকায় গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন।

চার হাজার? আমাকে তো বললেন, আট হাজার।

একেক জনের কাছে একেক কথা বলছেন। কোনটা সত্যি কে জানে। গাছ কাটার লোকও চলে এসেছে। বিজু ভাইয়া বলেছে গাছে হাত দিলে খুনখুনি হয়ে যাবে।

বিশ্রী ব্যাপার দেখি।

কি যে বিশ্রী–কল্পনা করতে পারবে না। রোজ ঝগড়া। জঘন্য সব গালাগালি। বড় চাচা ঐ দিন বলে গেল গুণ্ডা দিয়ে বিজু ভাইয়ার চোখ উপড়ে নেবে।

সে কি?

চল আপা, রান্নাঘরে চল। রান্নাঘরে গেলেও তোমার খারাপ লাগবে। মা যা মারা মেরেছেন। খবরদার, আবার ঐ নিয়ে কথা বলতে যেও না। কিছু বললেই মা.......

ঊর্মি কথা শেষ করল না। কারণ জাহানারা এক কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকেছেন। সোমা নিচু হয়ে সালাম করল। জাহানারা বললেন, সালাম কেন আবার? নে চা নে। নাশতা খেয়ে এসেছিস?

না।

বিজুরা আসুক। একসঙ্গে নাশতা দেব। তোর জিনিসপত্র কোথায়?

ঐ স্যুটকেস। জিনিসপত্র আর কিছু নেই।

আনতে দেয় নি?

নিজেই আনি নি।

ব্যবহারী জিনিসগুলো তো আনতে পারতি। আবার তো টাকা খরচ করে কিনতে হবে। হাতের বালাগুলো কোথায়?

রেখে এসেছি।

রেখে এলি কেন?

আমার আনতে ইচ্ছা করল না।

জিপের শব্দ শোনা গেল। ঊর্মি চলে গেল দরজা খুলে দেবার জন্যে। জাহানারা মেয়েকে হাত বাড়িয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। এই মেয়েটি তাঁর বড় আদরের। জাহানারার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

সোমা মৃদু স্বরে বলল, চা গায়ে পড়ে গেছে মা। হাত আলগা কর। জাহানারা হাত আলগা করলেন না। সোমা ভেবে রেখেছিল, এ-বাড়িতে এসে সে কিছুতেই কাঁদবে না। কঠিন পাথর হয়ে থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারল না। মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। বিজু ভেতরে একনজর উকি দিয়ে আবার বাইরে চলে গেল।

সাইফুদ্দিন সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। কি বলবেন, এটা ঠিকঠাক করতে করতে তাঁর অনেক সময় গেল। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর কিছু মনে আসে না। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তিনি কি বলবেন তা আগে থেকেই ঠিকঠাক করা থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনা বদলে যায়। ঠিক করে রাখা কথাগুলো বলা হয়ে ওঠে না। আজকের দিনের জন্যে যেসব কথা ঠিক করে রেখেছেন সেগুলো হচ্ছে, সবকিছু যে ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়েছে এটা অত্যন্ত

আনন্দের ব্যাপার। আরো খারাপ হতে পারত। সেটা হয় নি। এখন পুরানো কথা সব ভুলে গিয়ে একটা ফ্রেশ স্টার্ট নিতে হবে। লাইফের রিয়েলিটি স্বীকার করতে পারা হচ্ছে বিরাট গুণ।

ঠিক করে রাখা কথা একটাও বলা গেল না। হাউমাউ করে যে-মেয়ে কাঁদছে তাকে কিছুই বলা যায় না। সাইফুদ্দিন সাহেব ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন, নাশতার কি হয়েছে দেখ তো মা।

এ-বাড়ির ভিতরের বারান্দায় লম্বা একটা ছয় চেয়ারের টেবিল আছে। কোন চেয়ারে কে বসবে তা নির্দিষ্ট করা। সাইফুদ্দিন সাহেব এবং বিজুবসে মুখোমুখি দুজন দুই প্রান্তে। বাকি চারটি চেয়ারের একটিতে ঊর্মি, অন্যটিতে জাহানারা। তারা বসে কোনোকুনিভাবে।

আজ দীর্ঘদিন পর নিয়ম ভঙ্গ হল। সোমা ভুল করে তার বাবার চেয়ারে বসে পড়েছে। সাইফুদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। নিজের চেয়ারে না বসলে তিনি ভালোমতো খেতে পারেন না। হাত রাখার জায়গাটা অপরিচিত লাগে। নির্দিষ্ট যে-কাঠের উপর ডান পা রাখেন সেই কাঠ না থাকায় পাটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তিনি আজ বসেছেন ঊর্মির চেয়ারে। কাজেই সব এলোমলো হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পর বাবা এবং ছেলে বসল পাশাপাশি। দুজনের চেহারার মিল খুবই বেশি। বিজু বুড়ো হলে কেমন দেখতে হবে তা সাইফুদ্দিন সাহেবের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সোমা লক্ষ করল দুজনেই রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসছে। যেন তাদের মধ্যে গোপন কোনো রহস্যের ব্যাপার আছে। বাইরে কড়ই গাছ কাটা হচ্ছে। করাত চালানোর শব্দ আসছে। পিতাপুত্র কাউকে গাছকাটা নিয়ে চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। ঊর্মি বলল, ভাইয়া গাছ তো কাটা শুরু করেছে।

বিজু হাসিমুখে বলল, কাটুক।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সাইফুদ্দিন সাহেবও বললেন, কাটুক।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, দিনে-দুপুরে ডাকাতি করবে কিছু বলবে না?

বিজু চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, না।

সাইফুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, আমরা কিছুই বলব না। কথা শেষ করেই তিনি বিজুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন। বিজু হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, গাছ কাটার পর খেলা জমবে। অপেক্ষা কর–আগে গাছটা কাটা থোক।

ঊর্মি বলল, মারামারি করবে?

বিজু বলল, না। কিছুই করব না। বসে বসে শুধু মজা দেখব। গাছ কাটা শেষ হবার পরপরই একটা মজার ব্যাপার হবে। মজার ব্যাপারটা কী বলে দেব বাবা?

বলে দে।

বিজু মজার ব্যাপার ব্যাখ্যা করল সোমার দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটা কি হয়েছে। আপা শোন, বিগ ম্যাঙ্গো করল কি.......

বিগ ব্যাঙ্গো কে?

বিগ ম্যাঙ্গো হচ্ছে আমাদের সম্মানিত বড় চাচা মুখটা ফজলি আমের মত তো তাই তার নাম বিগ ম্যাঙ্গো। যাই হোক, বিগ ম্যাঙ্গো কি করল শোন—অত্যন্ত গোপনে গাছ বিক্রির ব্যাপারটা এক লোকের সঙ্গে ফাইন্যাল করে ফেলল। চার হাজার টাকা। আসল দাম খুব কম হলেও আট হাজার। যাই হোক, আমি ঐ লোকের সাথে দেখা করলাম। তাকে একটা খুব খারাপ কথা বললাম, সেটা তোমাদের না শুনলেও চলবে। সঙ্গে তিন জন মস্তান নিয়ে গেলাম। গাছওয়ালার নাম কুদ্দুস। ভয়ে সে তখন প্যান্ট ভিজিয়ে দেয় স্টেইজে আছে। আমি বললাম, কুদ্দস মিয়া, গাছ কিনতে যাচ্ছ খুবই ভালো কথা। তবে গাছ আমার। টাকা তুমি আমাকে দেবে এবং এখন দেবে, তারপর গাছ কেটে নিয়ে যাবে। যার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে তাকে বলবে গাছের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আমি তোমাকে পাকা রসিদ দেব। তবে ঐ পার্টি যেন গাছ। কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু জানতে না পারে। ব্যাস, কাজ খতম। রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছি। বিগ ম্যাঙ্গোর অবস্থা কি হয় এটা দেখার জন্যে সারা দিন ঘরে বসে থাকব। হা-হা-হা। বিজু দুলে-দুলে হাসতে লাগল।

বিজুকে এখন কেমন যেন অচেনা লাগছে। তার চেহারায় যে মায়া মায়া ভাবটা ছিল তা নেই। চোখ পিটপিট করে ধূর্ত মানুষের মতো তাকাচ্ছে। বিজুর ভালো নাম বিজয়। যোলই ডিসেম্বর জন্ম বলেই এই নাম।

আদরে আদরে বিজয় হয়ে গেছে বিজু। এই বিজু ছটা লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করে চারদিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। সেই বিস্ময় দীর্ঘস্থায়ী হল না। ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে গেল। ইউনিভারসিটিতে অনেক চেষ্টা করেও ভর্তি হওয়া গেল না। ভর্তি হল জগন্নাথ কলেজে। সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে নিল ইতিহাসে অনার্স। বর্তমানে সে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে। কলেজ সংসদের সে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক। কোথায় যেন

গানও শেখে। দু-একটা ফাংশনে গণসংগীত গেয়েছে। সাইফুদ্দিন সাহেব পুত্রের এইসব প্রতিভাতেও মোটামুটি মুগ্ধ। ইদানীং তাঁর মনে হচ্ছে পড়াশোনার দিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সাইডও থাকতে হবে। অন্য সাইড যদি ভালো হয় তা হলে পড়াশোনায় একটু ডাউন হলেও ক্ষতি নেই। থার্ড ডিভিশন পাওয়া একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় চাকরি পেয়ে যায়। আর ফার্স্ট ডিভিশনওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে।

টেবিল এখন ফাঁকা। ঊর্মি চলে গেছে কলেজে। বিজু কলেজে যায় নি। অন্য কি-একটা কাজে গেছে, আধ ঘন্টার মধ্যে না-কি এসে পড়বে। জাহানারা আবার রান্নাঘরে ঢুকেছেন। শুধু সোমা তার বাবার সঙ্গে বসে আছে। সাইফুদ্দিন সাহেব বুঝতে পারছেন না সোমা সম্পর্কে ভেবে রাখা কথাগুলো এখন বলবেন, কি বলবেন না। বললে এখনই বলা উচিত।

সোমা।

জ্বি।

ও কি কোনো ঝামেলা করেছিল না-কি?

না।

বুঝতে পেরেছে ঝামেলা করে লাভ হবে না। নয় তো এত সহজে ছাড়ত না।

হতে পারে।

বিজু অবশ্যি সবরকম প্রিকশন নিয়ে রেখেছিল।

বিজু খুব কাজের ছেলে হয়েছে।

খুবই অ্যাকটিভ। অনেক লোকজনের সঙ্গে চেনা-জানা। অনেক কবি-সাহিত্যিকেও চেনে। ঐ দিন বাসায় দাওয়াত করে ঔপন্যাসিক শওকত আলীকে নিয়ে এসেছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

পড়াশুনা কেমন করছে?

করছে। পড়াশুনাও করছে। দুটো সাইডই ঠিক আছে। এখন তুই যখন আছিস নিজেই দেখবি।

তুমি আজ বেরুবে না?

না। বের হবার দরকার ছিল অবশ্যি। থাক, ব্যাপারটা দেখেই যাই।

কোন ব্যাপার?

গাছ কাটার পর কি হয় ঐটা আর কি।

সোমা শীতল গলায় বলল, এরকম একটা ছেলেমানুষির মধ্যে তুমি আছ কেন। বাবা? তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও।

সাইফুদ্দিন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা তাঁর কিছুতেই মনে আসে না। তিনি মিনমিনে গলায় বললেন, তোর মাকে এক কাপ চা দিতে বল তো। সোমা চায়ের কথা বলার জন্যে উঠে গেল। জাহানারা বললেন, তুই শুয়ে থাক। রেস্ট নে।

রেস্ট নেবার কি আছে মা? আমি তো আর হাসপাতাল থেকে ফিরছি না। রোগশোকেও হয় নি।

চা খাবি আরেক কাপ?

খাব। কাজের ছেলেটা কোথায় মা?

বাজারে গেছে।

ঐটুকু ছেলে আবার বাজার করে না-কি?

বাজার করে, চুরি করে, সবই করে।

মা।

কি?

এই রকম করে আর মারধোর করো না।

জাহানারা চা ঢালতে ঢালতে বললেন, আর মারব না।

সোমা বাবাকে চা দিয়ে আবার রান্না ঘরে ফিরে এল। জাহানারা চুপচাপ বসে আছেন। যদিও এই মুহূর্তে রান্নাঘরে তাঁর কোনো কাজ নেই। সোমা বলল, সবকিছু কেন জানি অন্যরকম লাগছে।

যতই দিন যাবে ততই দেখবি আরো অন্যরকম লাগবে।

তুমি এখন রান্নাঘরে বসে আছ কেন?

যাব কোথায়? রান্নাঘর ছাড়া আমার যাবার জায়গা আছে?

ছদরুদ্দিন সাহেব গাছ কাটার তদারক করছেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তাঁর মাথায় ছাতি ধরা আছে। সাত ফুটের এক একটা টুকরো করা হচ্ছে। তিনি নিজেই গজফিতা দিয়ে মেপে দেখলেন। বিকেলে মিস্ত্রিদের চা এবং মুড়ি খাওয়ালেন।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে কুদুস তাঁকে বলল যে, গাছের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। রেভিন স্ট্যাম্পে দেওয়া পাকা রসিদও কুদুস তাঁকে দেখাল। শুকনো গলায় বলল, বিশ্বাস না হলে বিজু ভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। উনি ঘরেই আছেন।

ছদরুদ্দিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, বিশ্বাস না হবার কিছু নেই। বিশ্বাস হচ্ছে। ঠিক আছে তুমি যাও।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার দরুদ্দিন সাহেব এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

৩. লোকটার নাম কামাল

লোকটার নাম কামাল।

কামালউদ্দিন। বয়স সাঁইত্রিশ। তবে কানের কাছের সব চুল পেকে যাওয়ায় বয়স খানিকটা বেশিই দেখায়। ঠিক রোগা তাকে বলা যাবে না, তবে কেন জানি রোগা দেখায়। মুখটা গোলগাল। ভালোমানুষি ভাব অনেক কষ্ট করে আনে। নিজের ঘরে যা তাকে করতে হয় না। আজ অবশ্যি কামালের চেহারায় ভালোমানুষি ভাবটা নেই। সকালে দাড়ি কামানো হয় নি। খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি বের হয়ে পড়েছে। চোখটাও যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপর পানি পড়ছে। রুমালটাও সঙ্গে আনা হয় নি। তাকে শার্টের হাতায় চোখ মুছতে হচ্ছে। খুবই বিরক্তির ব্যাপার।

কামালউদ্দিন যে কাজে নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিল কাজটা পাওয়া গেছে। তবে ঝামেলা আছে। তাদড় পার্টি। পানিতে না নেমে মাছ ধরতে চায়। কামাল বড়ই বিরক্ত হচ্ছে। তবে এই বিরক্তি সে প্রকাশ করছে না। তার সামনে বসে আছে সুলতান সাহেব। চেহারা ভালোমানুষের মতো। কথাবার্তার ভঙ্গিও বড় মধুর। কথা শুনলে মনে হয় শান্তিনিকেতন থেকে কথা শিখে এসেছে। অথচ বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লায়। বিরাট ফক্কড় লোক।

কামাল বলল, কথাবার্তা যা বলার দরকার তা তো বলেই ফেললাম এখন তা হলে উঠি ভাইসাব? অনুমতি যদি দেন।

আরে বুসন না। আরেকটু বসুন। লাচ্ছি খান। লাচ্ছি আনতে গেছে।

লাচ্ছি খেলে তো আমার হবে না—আমার তো আরো কাজকর্ম আছে।

এখানেও কাজকর্মই তো করছেন—তাই না।

করছি আর কোথায়। কথাবার্তা বলছি। এত কথা আমার ভালো লাগে না। দরে বনলে কাজ করবেন, না বলে না।

সুলতান সাহেব বললেন, সামান্য কাজ এত টাকা চাচ্ছেন।

কামাল শান্ত গলায় বলল, কাজটা সামান্য না। এটা আমিও জানি, আপনিও জানেন। দলিল তৈরি করে দিব। সেই দলিল হবে আসল দলিলের বাবা। কোর্টে গেলে আমার দলিল টিকবে। আসলটা টিকবে না। এই জন্যে টাকা খরচ করবেন না? পঞ্চাশ লাখ টাকার সম্পত্তি পাবেন আর এক লাখ টাকা খরচ করবেন না?

সুলতান সাহেব বললেন, আপনাকে ত্রিশ দিতে পারি তবে জিনিস দেখার পরে, তার আগে না। দেখেন আপনি রাজি আছেন কি-না।

কামাল গম্ভীর হয়ে রইল। লাচ্ছি চলে এসেছে। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে একটানে লাচ্ছি শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, উঠি তা হলে ভাইসাব-স্লামালিকুম।

উঠি মানে? হ্যাঁ-না কিছু বলেন।

আমি ভাইসাব এককথার মানুষ। এক লাখ চেয়েছি এক লাখ দেবেন। পুরানো স্ট্যাম্প জোগাড় করে নিব, কলম দিয়ে লেখলেই দলিল হয় না। রেকর্ড রুমের রেকর্ড ঠিক করা

লাগে। খাজনার রসিদ লাগে। মিউটেশনের কাগজপত্র লাগে। আমার কাজকর্ম আপনে জানেন না, তাই মাছের দর শুরু করেছেন। নকল দলিল এক হাজার টাকা দিলে করা যায়, কিন্তু ঐ জিনিস কোর্টে গেলে জজ সাহেব ঐ দলিলে নাকের সর্দি ঝাড়বে, বুঝলেন?

কামাল উঠে পড়ল। এটা হচ্ছে তাদড় পার্টি। এখানে লাভ হবে না। খালি খেলাবে। গোসল করতে চায় অথচ চুল ভিজাতে চায় না। হারামজাদা।

সুলতান নড়েচড়ে বসলেন। মুধর স্বরে ডাকলেন, কামাল সাহেব।

কি-বলেন।

সামনের সপ্তাহে কি আরেক বার আসতে পারেন?

কেন?

না মানে, আরো ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখতাম।

গরম যা পড়েছে তার মধ্যে তো মাথা আর ঠাণ্ডা যাবে না। যত চিন্তা করবেন মাথা তত গরম হবে।

সুলতান সাহেব বললেন, প্লিজ আপনি সামনের সপ্তাহে এক বার আসুন। আমার বড় শ্যালকও থাকবে। সে হচ্ছে এক জন ল ইয়ার। আইনের ব্যাপারগুলো ভালো বুঝবে। আপনি আসুন। আমি আসা-যাওয়ার খরচ দিয়ে দিচ্ছি।

সুলতান সাহেব মানিব্যাগ খুলে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করলেন। কামাল মনে মনে বলল, শুয়োরের বাচ্চা, আসা-যাওয়ার খরচ পঞ্চাশ টাকা? মুখে বলল, এই পঞ্চাশ টাকা আপনি রেখেই দেন ভাইসাব। পঞ্চাশ-এক শ আমি নেই না। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা আমি ভিক্ষাই দিই। পাপ কাজ করি তো, দান-খয়রাত করতে হয়। উঠলাম ভাই, স্লামালিকুম।

দাঁড়ান, দাঁড়ান—একটু দাঁড়ান। এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

সুলতান সাহেব ভেতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ শ টাকার একটা নোট নিয়ে এসে অমায়িক গলায় বললেন, এই নিন আপনার খরচ। সামনের সপ্তাহে আসুন, দেখি একটা এগ্রিমেন্টে যাওয়া যায় কি-না। এইসব কথা কি লাখ কথার কমে হয়?

হবার হলে এক কথাতেই হয় না হলে লাখ কথাতেও হয় না। আমি আসব সামনের সপ্তাহে। সন্ধ্যা নাগাদ আসব। বুধবার সন্ধ্যা।

আচ্ছা।

কামাল ঘর থেকে মোটামুটি খুশি হয়েই বের হল। তাদড় পার্টির কাছ থেকে পাঁচ শ টাকা বের করা গেছে এই যথেষ্ট। এই পার্টির ত্রিসীমানায় সে আর আসবে না। আসার দরকার নেই। এই পার্টির কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। ঢাকার বাসে উঠে সে পাঁচ শ টাকার নোটটা চোখের সামনে মেলল। ছেড়া নোট। স্কচ টেপ দিয়ে মেরামত করা। মনে মনে বলল, হারামজাদা। দুনিয়া সুদ্ধ লোক ঠকাতে চাস। ব্যাটা ফকিরের পোলা।

ফকিরের পোলা হচ্ছে কামালের একটা প্রিয় গালি। তবে এই গালি সে সবসময় মনে মনে দেয়। মনে মনে গালি দিতে পারার সুযোগ থাকায় সে আনন্দ বোধ করে। তার ধারণা মনে মনে গালাগালি দেবার সুযোগ না থাকলে বিরাট সমস্যা হত। গাল দিলেই রাগ বাষ্প হয়ে যায়। কামাল আবার বলল, হারামজাদা ফকিরের পোলা।

কামালের কাজকর্ম খুব পরিষ্কার। সে কখনো বেশি ঝামেলায় যায় না। নকল দলিলের কথাবার্তা পাকা করে। বেশ কিছু দলিলেন নমুনা দেখায় তারপর সটকে পড়ে। দিন পনের পর যখন পার্টি মোটামুটি নিশ্চিত যে, সে সটকে পড়েছে তখন হঠাৎ উদয়। হয়। মুখ-চোখ কালো করে বলে, বিরাট সমস্যা ভাই সাব। পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিন দিন ছিলাম হাজতে। জামিনে ছাড়া পেয়েছি। পার্টি এইকথা ঠিক বিশ্বাস করে না। সে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর একটা কালো দাগ দেখিয়ে বলে, এই দেখেন ভাই অবস্থা। মারের নমুনা দেখেন।

হাতের এই দাগটা কামালের জন্মদাগ। তবে মারের কারণে কালো হয়ে যাওয়া দাগ হিসেবে একে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। কামাল গম্ভীর গলায় বলে, কার কি কাজ করছি এটা জানার জন্যে পুলিশ হেভি চাপ দিল। আপনাদের কথা অবশ্য কিছু বলি নাই।

পার্টি এই কথায় একটু সচকিত হয়। নড়েচড়ে বস। তখন কামাল বলে, আপনাদের জানাশোনার মধ্যে পুলিশের বড় কেউ আছে? বিরাট বিপদে পড়েছি ভাইসাব।

এই পর্যায়ে কামালের চোখে পানি এসে যায়, চোখে পানি আনার ক্ষমতা কামালের অসাধারণ। অতি অল্পসময়ে সে তা পারে। তার জন্যে যা করতে হয় তা হচ্ছে চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। এতেই কাজ হয়। চোখে পানি আসে। তার

চোখে একটা সমস্যা আছে। ছোটবেলায় চোট পেয়েছিল। এর জন্যে হয়তো চোখে পানি আসে খুব তাড়াতাড়ি।

মানুষ সবকিছুকেই অবিশ্বাস করে। চোখের পানিকে করে না। ভাগ্যিস করে না। যদি করত তা হলে কামালের মতো মানুষদের খুব অসুবিধা হত।

দলিল তৈরি কামালের মূল ব্যবসা নয়। তার মূল ব্যবসা জমি বেচা-কেনা। একদল লোক বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ায় এই ব্যবসা খুব রমরমা হয়েছে। কিছু মানুষের হাতে কাঁচা টাকা-পয়সা এসেছে যাদের হাতে কোনো কালেই কোনো পয়সাকড়ি ছিল না। হঠাৎ পাওয়া ধন তারা কি করবে বুঝতে পারে না তখন জমির টোপ ফেলতে হয়। এগুতে হয় খুব সাবধানে। এইসব ধনীরা সাধারণত খুব সন্দেহপরায়ণ হয়। কোনকিছুই তারা বিশ্বাস করে না। সবকিছুতেই অবিশ্বাস। পাকা দলিল দেখেও বলে—দলিলটা তো নকল। তাদের ঘায়েল করতে হয় তাদের নিজেদের অস্ত্রে। যেমন গত মাসে কামাল একটা কেইস করল পার্টির বাসা নূরজাহান রোডে। ছোট ভাই কাজ করছে বিদেশে। টাকাপয়সা ভালোই পাঠাচ্ছে। খোঁজ-খবর আগে থেকে ভালোমলতা নিয়ে কামাল উপস্থিত হলহাতে ব্রিফকেস। চোখে চশমা।

বড় ভাই দরজা খুলে খুবই সন্দেহজনকভাবে তাকাতে লাগল। কামাল বলল, ভাই, আমার নাম কামাল। শুনলাম জমি কিনতে চান, সেই জন্যে আসলাম।

বড় ভাই মুখ লম্বা করে দিয়ে বলল, কার কাছে শুনলেন?

সেটা দিয়ে তো ভাই আপনার দরকার নাই। কিনবেন কি কিনবেন না সেটা দিয়ে। হচ্ছে কথা। যদি বলেন না, তা হলে বিরক্ত করব না। চলে যাব। যদি বলেন হ্যাঁ, তা হলে বসব। কথা হবে।

সন্দেহপ্রবণ লোকেরা সোজাসুজি কথায় সাধারণত একটু ঘাবড়ে যায়। কারণ এরা সারা জীবনেও সোজাসুজি কথা বলে না।

বড় ভাই বললেন, জমি কোথায়?

সারা ঢাকা শহর জুড়ে আমার জমি নাই। এক জায়গাতেই আছে। তিন বিঘা জমি আছে। জায়গাটা হচ্ছে সাভার। জায়গার নাম নয়নপুর।

এত দূর জমি কিনব না।

ঠিক আছে। না কিনলে কি আর করা, নেন ভাই একটা সিগারেট নেন। কামাল সস্তা ধরনের একটা সিগারেট বের করল। সন্দেহপ্রবণ লোকদের দামি সিগারেট দেওয়া যায় না। দামি সিগারেট দিলেই ভাবে কোন একটা মতলবে এসেছে।

বড় ভাই সিগারেট নেন। নেবেন জানা কথা। বিনা পয়সার কোনো জিনিস এরা ছাড়ে না। কামাল নিজের মনেই বলে সবাই জমি কিনতে চায় ঢাকা শহরে। দূরে কেউ যাবে না। ঢাকা শহরে কি জমি আছে যে কিনবে? বিনা ঝামেলায় একটা প্লট কেউ বার করুক ঢাকা শহরে। যদি বার করতে পারে আমি কান কেটে ফেলে দিব। জমি কিনার পর মিউটেশান

করতে গেলে দেখা যায় আরেক পার্টির কাছে জমি বিক্রি করা। এর পর বের হয় থার্ড পার্টি। এই থার্ড পার্টি জমি দখল করে বসে থাকে। মামলা ঠুকে দেয়। রাইট অব পজেশান। এইসব দেওয়ানি মামলার অবস্থা জানেন? দেওয়ানি মামলা হল আপনার কচ্ছপের কামড়। এক বার ধরলে আর ছাড়ে না। পনের বছর, বিশ বছর, পঁচিশ বছর মামলা চলতে থাকে।

আচ্ছা ভাই যাই। অনেক বিরক্ত করলাম।

বসেন একটু। রোদের মধ্যে এসেছেন। এক কাপ চা খান।

কামাল সঙ্গে-সঙ্গে বলে, তা খাওয়া যায়। চা পেলে বড় ভালো হয়। চা আসে। কামাল বলে, একটা ভালো সিগারেট খাবেন ভাই সাব? নিজের জন্যে কিছু ভালো সিগারেট আলাদা রাখি। কোনো শালাকে দেই না। নিন একটা খান।

বড় ভাই সিগারেট ধরান। এর মধ্যে লোটার প্রতি তাঁর সন্দেহ খানিকটা কমে এসেছে। তিনি মনে করতে শুরু করেছেন—লোকটা ভালো, এককথার মানুষ। কামাল বলে, একসময় ধানমণ্ডির জমি কেউ কিনতে চাইত না। চোখ আসমানে তুলে বলত, সর্বনাশ! এত দুরে জমি কিনে কি করব? জংলা জায়গা! আর আজ সেই জংলা জায়গার অবস্থা দেখেন।

ঠিক বলেছেন।

সাভারেও লোকজন এখন জমি কিনতে চায় না। বলে জংলা জমি। আমি হাসি। আর মনে-মনে বলি-ব্যাটা দশটা বছর যাক তার পর তোর মুখখান এক বার এসে দেখে যাব।

সূচিপত্র

বড় ভাই বলেন, সাভারের জমি কি আপনার?

পাগল হয়েছেন? আমি জমি পাব কোথায়? আমি একজন পথের ফকির। জমি আমার বড় মামার। আমাকে বলেছে বিক্রি করে দিতে। আমার হয়েছে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। ঐ জমি বিক্রি হবে না। বেহুদা পরিশ্রম।

বিক্রি হবে না কেন?

তিন বিঘা জমি পুরোটা এক জনের কাছে বেচতে চায়। কার দরকার পড়েছে। একসঙ্গে এতটা জমি কেনার? ভাই উঠি দেরি হয়ে গেছে। চা-টা ভালো বানিয়েছেন।

আরে বসেন না। আরেক কাপ চা খান। অসুবিধা কি? খান আরেক কাপ চা।

কামাল বসে। আরাম করেই বসে। পার্টি টোপ গিলে ফেলেছে। এখন শুধু সুতা ছাড়তে হবে। সুতা ছাড়তে তার বড় ভালো লাগে। সুতা ছেড়ে মাছ সবসময় ঘরে তোলা যায় না। সুতা ছিঁড়ে যায়। তবে এই মাছ সে তুলেছিল। অবিশ্বাসী লোক যখন কাউকে বিশ্বাস করে তখন পুরোপুরিই করে। এই লোক করেছিল। ইচ্ছা করলে লোকটাকে সে পথের ফকির করতে পারত। তা সে করে নি। মায়া লাগল। বায়নার পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েই ছেড়ে দিল। মনে মনে বলল, ব্যাটা ফকিরের পোলা, তোক মাফ করে দিলাম।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। দরজা খুলল মিলু। কামাল সার্ট খুলতে-খুলতে অভ্যাসমতো ডাকল, সোমা, ও সোমা। ঢাকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল সোমা নেই।

মিনু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। তাঁর চোখে কৌতূহলের সঙ্গে খানিকটা ভয়ও মিশে আছে। মানুষটিকে সে বেশ ভয় করে। লোকটাকে তার পাগলা পাগলা মনে হয়। জ্বর কমেছে না-কি রে মিনু?

হ।

রান্নাবান্না করেছিস কিছু?

হ।

আরে যন্ত্রণা, সবকথা এক অক্ষরে বলছিস কেন? চড় খাবিবুঝলি। ঠাশ করে একটা চড় দিব। কী বেঁধেছিস?

ভাত।

ভাত ছাড়া আর কী?

আর কিছু না।

ফকিরের মাইয়া বলে কী? শুধু ভাত খাব কীভাবে?

আর কিছু রানতে জানি না।

এর ওপরে কোনো কথা চলে না। রাঁধতে না জানলে সে করবে কী? কামাল বলল, শুকনো মরিচ ভেঙ্গে ফেল। পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচের ভর্তা বানিয়ে খাওয়া যাবে। মরিচের ভর্তা ঠিকমতো বানাতে পারলে কোপ্তা-কালিয়ার মতো টেস্ট হয়। ঘরে সরিষার তেল আছে তো? সরিষার তেল দিয়ে হেভি ডলা দিতে হবে।

বিড়ালটা পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে। আহ্লাদ করছে। কামাল নিচু হয়ে বিড়ালটাকে খানিকক্ষণ আদর করল। আদর খেয়ে সে একেবারে চলে যাচ্ছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। আদর সবাই বোঝে। শুধু মানুষ ববাঝে না। মানুষ হচ্ছে বিচিত্র চিড়িয়া। সে আদর সোহাগ বোঝ না। রাগটা বোঝে। ঘৃণা বোঝে। শালার মানুষ।

মিনু।

জ্বি।

বেড়ালটারে দুধ দিয়েছিলি?

না। না কি রে হারামজাদী—এমন চড় দেব......

দুধ কেমনে বানাইতে হয় জানি না।

কামাল রাগ সামলে নিল। যে দুধ বানাতেই জানে না তাকে দুধ না বানানোর জন্যে চড় দেওয়া যায় না। সোমা এই মেয়েটাকে দেখি কিছুই শেখায় নি। অকর্মার ধাড়ি করে রেখেছে।

ও মিনু।

জ্বি।

খাওয়াদাওয়ার পর দুধ বানানো শিখিয়ে দিব-বুঝলি। খুব সোজা। বিড়ালটাকে রোজ দুধ দিবি। পেটে বাচ্চা আছে। এই সময় ভালোমল খাওয়ার দরকার। আর খবরদার লাথিফাথি দিবি না। বাচ্চার ক্ষতি হবে। যা ভাত বাড়। শুকনো মরিচ ভাজ। পুড়িয়ে আবার কালো করে ফেলিস না। কালো যদি হয় এক থাবড়া খাবি।

সাবান গামছা নিয়ে কামাল বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুমে ঢুকেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি সুন্দর সাজানো বাথরুম। ঝক ঝক করছে। এককণা ময়লা কোথাও নেই। অপরিষ্কার বাথরুম ছিল সোমার দু চোখের বিষ। সোমার মতে বাথরুম এমন হবে যেন ঢুকলেই মনের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব হয়। এই মেয়ের কথাবার্তার কোন মা-বাপ নেই। পরিষ্কার বাতিক। এত পরিষ্কার দিয়ে হয় কি? দুনিয়াটাই অপরিষ্কার। এর মধ্যে পরিষ্কার পরিষ্কার করে চেঁচালে কি হবে? কিছুই হবে না। আজ এই বাথরুম ঝক ঝক করছে। সাত দিন পরে করবে না। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। কোনকিছুই আটকে থাকে না। কামাল গায়ে পানি ঢালতে লাগল। ঠাণ্ডা পানি গায়ে ঢালতে বড় আরাম লাগছে। ঘুম এসে যাচ্ছে। সে গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজল। তার বেশ ভালো লাগছে।

কামাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুল। ঘুম ভাঙার পর ডাকল, সোমা, ও সোমা। এক দিনে দ্বিতীয় বার ভুল। মেজাজ খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। মেজাজ কিছুটা খারাপই হল। যে গেছে সে গেছে—এখন ডাকাডাকি করে হবেটা কী? কিছুই হবে না। মানিয়ে নিতে হয়। সব অবস্থায় সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা।

মিনু।

জ্বি।

চা বানা দেখি।

চা রানতে জানি না।

অতি উত্তম। হারামজাদী, তুই জানিস কি? ফ্লাস্ক নিয়ে যা মোড়ের দোকান। থেকে চা নিয়ে আয়। বিড়ালকে দুধ দিয়েছিলি?

হ।

গুড। দু বেলা দুধ দিবি সকালে এক বার, রাতে এক বার। যা চা নিয়ে আয়।

কামাল বিছানা ছেড়ে নামল। হাতমুখ ধুয়ে সিগারেট ধরাল। তার মনে হল সোমার অভাব সে যতটা বোধ করবে ভেবেছিল তার চেয়ে অল্প একটু বেশি বোধ করছে। এর কারণ সে ঠিক ধরতে পারছে না। তার হিসাবে ভুল খুব একটা হয় না। এখানে ভুল হল কেন?

মিন ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছে। হোটেলের চা বিস্বাদ হলেও এর আলাদা একটা স্বাদ আছে। এই স্বাদে আবার অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে। সেটা মন্দ কি। স্বাধীন জীবনের আলাদা আনন্দ আছে। চা খেতে খেতে কামালের মনে হল—শুধু স্বাধীন জীবন না, সবধরনের জীবনেরই আলাদা আনন্দ আছে। যে তের মাস সে জেল খাটল সেই তের মাস সময়টাও

তার খুব একটা খারাপ কাটে নি। জেলে তার সঙ্গীরা মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। যথেষ্ট বুদ্ধিমান। শুধু বুদ্ধিমান নারসিকও ছিল। এদের এক জন বিনয় পোদ্দার। বার বছরের কয়েদ হয়েছিল। কি অসম্ভব রসিক মানুষ। তার আশেপাশে থাকাই একটা আনন্দের ব্যাপার। এক বার জেলখানায় ইম্প্রভ ডায়েট হল ঈদ উপলক্ষে। পোলাও, গোস্ত আর একটা করে চপ। চপ মুখে দিয়েই সবাই থুথু করে ফেলে দিল। বাসি চপ। গরমে টক হয়ে গেছে। বিনয় পোদ্দার বলল, বাসি চপের গল্প শুনবে নাকি হে তোমরা। সবাই হৈ হৈ করে উঠল, বলেন, বলেন।

এক বার এক হোটেলে গেছি। চপের অর্ডার দিয়েছি। চপ আসল। মুখে দিয়ে দেখি, সর্বনাশবাসি মানে, পচে যাওয়া মাল। মেজাজ গেল গরম হয়ে। বেয়ারাকে বললাম, ডাক তোমার ম্যানেজারকে। এই পচা চপ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বেয়ারা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আপনি নিজেই যে জিনিস খেতে রাজি না ম্যানেজারবাবু সেটা কি করে খাবেন বলুন।

আহ কি গল্প। আর কি গল্প বলার ভঙ্গি। কামাল বিমর্ষ বোধ করছে। সন্ধ্যা সময়টা আসলেই খারাপ। মন ভার ভার হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় এই জন্যে ঘরে থাকতে নেই।

মিনু!

জ্বি।

আমি এখন বেরুব বুঝলি। ফিরতে রাত হবে। একা একা ভয় লাগবে?

হুঁ।

তা হলে কী করা যায় বলত?

আফা আসবে না?

না। ঐ সম্পর্ক শেষ। এখন তুই কী করবি চিন্তা করে দেখ। তোর খালার কাছে যাবি? তোর খালা থাকে না কলতাবাজার। যাবি সেখানে?

না।

যাবি না কেন?

খালা খাওন দেয় না।

এ তো দেখি আরেক যন্ত্রণা। তোকে কোলে নিয়ে আমি ঘুরব না-কি?

মিনু হেসে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে হাসি লুকাবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এই লোকের সামনে হাসতে বড় ভয় লাগে।

কামাল মিনু-সমস্যার কয়েকটা সমাধান বের করল—ঘরে তালা দিয়ে মিনুকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া। দুই, মিনুকে চায়ের দোকানে রেখে যাওয়া। ফেরার পথে উঠিয়ে নেওয়া। মিনুর হাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে তার কলতাবাজারে খালার কাছে পাঠিয়ে

দেওয়া। কোনো সমাধানই তার মনে ধরল না। মুখ অন্ধকার করে একের পর এক সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

৪. সোমার শোবার জায়গা

সোমার শোবার জায়গা ঠিক হয়েছে ঊর্মির সঙ্গে। এই ঘরে দুটো খাট। একটায় ঘুমায় বিজু, অন্যটায় ঊর্মি। ঘরে কোনো ফ্যান নেই। গরমের সময় অসহ্য গুমোট। দক্ষিণের জানালা একটা। ঐ জানালা বিজুর খাটের পাশে। বাতাস যা লাগে বিজুর গায়ে লাগে। ঘরে এখন আছে সোমা এবং ঊর্মি। বিজু বারান্দায় টেবিল পেতে পড়ছে। তার পড়া সশব্দ। এত বড় ছেলে এমন শব্দ করে পড়ে কেন কে জানে! সোমার খুব বিরক্তি লাগছে। ঊর্মি বলল, তুমি আসায় খুব সুবিধা হয়েছে আপা। বিজু ভাইয়া আর এই ঘরে সিগারেট খাবে না। সিগারেট খেয়ে ঘর অন্ধকার করে রাখে।

তাই নাকি?

হুঁ। সিগারেটের উপরই আছে। ঘুম ভাঙলেই হাতে সিগারেট। এক বার তো মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

সোমা কিছু বলল না।

ঊর্মি বলল, ঘুম পাচ্ছে আপা?

না।

কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? বৃষ্টিতেও গরম কমল না। আরেকবার গা ধুতে ইচ্ছা করছে। তুমি গা ধোবে আপঃ পানি কিন্তু আছে।

না।

তুমি খাটের কোন দিকে শোবে?

এক দিকে শুলেই হল।

ঐ বাড়িতে কোন দিকে শুতে?

প্রশ্নটা করেই ঊর্মি লজ্জা পেয়ে গেল। তার মনে হল প্রশ্নটা অনুচিত হয়েছে। ঐ বাড়ি প্রসঙ্গে কোনো কথাই এখন বলা উচিত না। যদিও তার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করছে। কেন এরকম হল? মানুষটা খারাপ এটা সে জানে। কতটুকু খারাপ? কেমন খারাপ? আপাকে কি জিজ্ঞেস করা যাবে? আজই জিজ্ঞেস করবে? নাকি আরো কিছুদিন পর?

সোমা বলল, বাবার রোজগারপাতি এখন কেমন রে ঊর্মি?

ভালো না। এল এম এফ ডাক্তারদের কাছে ঢাকা শহরে কেউ আসে? সব যায় স্পেশালিস্টদের কাছে। বাবা অবশ্যি রোজ ইয়াং ফার্মেসিতে বসে। ওরা মাসে মাসে বাবাকে কিছু টাকা দেয়। রুগী কিছু হয়। সংসার তো চলছে।

সোমা সহজ গলায় বলল, খুব ভালো চলছে বলে তো মনে হয় না।

তা চলছে না। চলবে কোত্থেকে? প্র্যাকটিস নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয়, বাবা ডাক্তারিও ভালো জানে না। আমার এক বার অসুখ হল। বাবা সমানে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছে, শেষে দেখা গেল টাইফয়েড। এ দিকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে খেয়ে আমার চুল উঠে গেল।

চুল উঠল কোথায়? মাথা ভর্তি তো চুল।

বাতি নিবিয়ে দিই আপা? বাতি নেবালে ঘর একটু ঠাণ্ডা হবে।

ঊর্মি বাতি নিবিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি পুরোপুরি অন্ধকার হল না। বিজুর পড়া শেষ হয়েছে। সে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। ঘুম ধরে যায়। তখন পানির ঝাপটা দিতে হয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে চা খেতে হয়। তার জন্যে ফ্লাস্কে চা বানানো থাকে। বিজু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে বাইরের বারান্দায় চলে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে চা খাবে। সিগারেট ধরানোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সোমা এল বারান্দায়। বিজু সিগারেট নিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। ফেলে দেবে না রাখবে? শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়াই ঠিক করল। এতটুকু একটা বাড়ি এর মধ্যে যদি তিন জনের সামনে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয় তা হলে তো বিরাট যন্ত্রণা।

বিজু বলল, এখন ঘুমাও নি, শুয়ে পড় আপা।

তুই কখন শুবি?

আমার দেরি আছে। দেড়টা-দুটার আগে ঘুমাতে যাই না।

এতক্ষণ কি করিস? পড়াশোনা?

হু।

ভালোই তো। আগের মতো রেজাল্ট করতে পারলে তো খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে।

ঐ সব হবে না। কিছু মনে থাকে না। যা পড়ি সব ভুলে যাই। আপা তুমি শুয়ে। পড়। এক কাজ কর, আমার বিছানায় শোও। দু জন একখাটে ঘুমুতে পারবে না। আমি বারান্দায় পাটি পেতে শোব। একস্ট্রা মশারি আছে, অসুবিধা হবে না।

রাতে বৃষ্টিটিষ্টি হয় যদি?

কোনো অসুবিধা নেই। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিতে বিজুর কিছু হয় না।

সোমা দাঁড়িয়েই রইল। তার ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঐ অসহ্য গরমে ঘরের ভেতর শুতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে বারান্দায় চেয়ারে এসে বসল। মৃদু সুরে ডাকল, বিজু

কি আপা?

তুই কি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলি না-কি?

কার সাথে?

সোমা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোর দুলাভাইয়ের কথা বলছি। ঝগড়া করেছিলি?

বিজু তিক্ত গলায় বলল, কি আশ্চর্য। দুলাভাই শব্দটা তুমি ব্যবহার করলে কেন? ঐ লোকের কথা যদি ওঠে এখন থেকে তুমি সোজাসুজি বলবেকামাল। নো দুলাভাই বিজনেস।

তুই আমার কথার জবাব দিস নি। ঝগড়া করেছিলি?

হ্যাঁ। লোকজন ছিল নয়তো চড় দিয়ে শালার দাঁত খুলে ফেলতাম।

এইসব তুই কি বলছিস?

তুমিই-বা উল্টা কথা বলছ কেন? ঐ শালাকে আমি কোলে নিয়ে চুমু খাব না-কি? সাপের যেভাবে খোলস ছাড়ায় ঐ ব্যাটার চামড়া আমি ঐভাবে খুলে নেব।

তোর এত রাগ কেন? তোর সঙ্গে তো কিছু হয় নি। রাগ যদি কারো হবার হয়। সেটা হবে আমার।

তোমার হবে না। তোমার মধ্যে রাগ বলে কিছু নেই। থাকলে এত দিন লোকটার সঙ্গে থাকতে পারতে না।

সোমা বলল, তোর কাছে আমার অনুরোধ বুঝলি বিজু, রাস্তায় যদি কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে হৈ চৈ করব না।

বিজু চুপ করে রইল। তার খুব রাগ লাগছে। এসব আপা কী বলছে? সোমা বলল, সব তো চুকেবুকেই গেছে আর হৈ চৈ কেন? ঠিক না?

আচ্ছা ঠিক আছে। যাও হৈ চৈ করব না। এখন ঘুমুতে যাও। আমার বিছানায় ঘুমিও আপা। দু-একদিনের মধ্যে ফ্যানের ব্যবস্থা করব। তখন আরাম হবে।

সোমা আবার তার ঘরে ঢুকল। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। অস্থির অস্থির লাগছে।

ঊর্মি বলল, আপা ঘুমুবে না?

সোমা জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছা করছে প্রফেসর সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করতে। ঊর্মি তাতে কিছু মনে করবে কি না কে জানে। মনে করার অবশ্যি কিছুই নেই। আর যদি মনে করে তাতেই বা কি।

আপা।

কি?

এ বাড়িতে এসে তোমার কি খারাপ লাগছে?

না।

আমার নিজের খুবই ভালো লাগছে। এ বাড়িতে আমার গল্প করার কেউ নেই। তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব।

দোতলায় যাঁরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই?

না। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক থাকেন। আর তাঁর এক খালা না কি কে যেন থাকেন। আমি ও বাড়িতে যাই না। চাচাঁদের বাসাতেও যাই না। আমার জীবন এই ঘরটার মধ্যে কেটে যাচ্ছে আপা।

সোমা চুপ করে রইল। পাশের ঘর থেকে চাপা অথচ রাগী গলা শোনা যাচ্ছে। সোমা বলল, এরকম করে কথা বলছে কে রে?

বড় চাচা। মাঝেমাঝে চাচা এরকম করে। মাথা গরম হয়ে যায় তখন এই সব শুরু করে।

তাই নাকি?

হুঁ। আমার মনে হয় বড়ো চাচা পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছে।

সোমা চুপ করে বড়ো চাচার কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করল। তেমন কিছু বোঝা যায় না তবে কেটে ফেলব পুতে ফেলব—এইসব শব্দ কানে আসছে।

৫. উর্মির ঘরে নতুন ফ্যান

উর্মির ঘরে নতুন ফ্যান লাগানো হচ্ছে। কড়ুই গাছ বিক্রির টাকায় কেনা ফ্যান। বিজুর উৎসাহের সীমা নেই। যদিও নীল গেঞ্জি গায়ে এক জন ইলেকট্রিশিয়ান আনা হয়েছে তবু পুরো কাজটা করল বিজু। কানেকশন দিয়ে সুইচ টিপল। ফ্যান ঘুরল না। ইলেকট্রিশিয়ান টেস্টার দিয়ে দেখে বলল, লাইন তো ভাইজান ঠিক আছে।

উর্মি বলল, ফ্যান ঠিক আছে তো? দোকানে চালিয়ে দেখেছ?

বিজু বিরক্ত গলায় বলল, না চালিয়ে ফ্যান কিনব না-কি?

উর্মি বলল, লোক-ঠকানো টাকায় কেনা তো, তাই ঘুরছে না।

বিজু চোখ লাল করে বলল, লোক-ঠকানো টাকা মানে? কি বলছিস তুই? গাছটা কার, আমাদের না অন্যদের?

আচ্ছা বাবা যাও—আমাদের। চিৎকার করছ কেন?

এমন চড় দেব না—জন্মের শিক্ষা হয়ে যাবে।

উর্মি বলল, চেঁচামেচি না করে চড় দিয়ে ফেল। তাও ভালো।

বিজু সত্যি-সত্যি চড় বসিয়ে দিল। উর্মি হতভম্ব হয়ে গেল। বিজ যে বাইরের একটা মানুষের সামনে চড় মারতে পারে তা তার কল্পনাতেও আসে নি। কেমন করে এটা সম্ভব

হল? হচ্ছে কি এসব? নীল গেঞ্জি পরা ইলেকট্রিশিয়ান ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে। দাঁত বের করে আসছে। ঊর্মির ইচ্ছা করছে বিজুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ছোটবেলায় এই জিনিসই করত। ছোটবেলায় যা করা যায় এখন তা করা সম্ভব না। সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় জাহানারা কেলি থেকে কাপে চা ঢালছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কাজের ছেলেটা সকালে বাজারের টাকা নিয়ে পালিয়েছে, আর ফেরে নি। সত্তর টাকা নিয়ে ভেঙ্গে গেছে। অথচ তার বেতন পাওনা ছিল দেড় শ টাকার ওপরে।

জাহানারা বললেন, সোমা কোথায় গেছে তুই জানিস?

ঊর্মি জবাব দিল না। সে কান্না থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। জাহানারা বললেন, কথা বলছি না কেন? সোমা কোথায় গেছে জানিস?

না।

চাটা বিজুকে দিয়ে আয়।

আমি পারব না মা।

জাহানারা কঠিন চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ফর্সা গাল রাগে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কি বললি?

কিছু বলি নি, দাওচা দাও দিয়ে আসছি।

ঊর্মি চায়ের কাপ বিজুর সামনে রেখে সহজ গলায় বলল, বিজু ভাইয়া চায়ে চিনি হয়েছে কি-না দেখ।

বিজু বলল, যা রহমানের জন্যে চা নিয়ে আয়—দেখ তাকিয়ে, প্রবলেম সলভ। ফ্যান বন-বন করছে। হা-হা।

ঊর্মি তাকাল। নীল-রঙা ফ্যান ঘুরছে। ঘরে প্রচুর বাতাস। অথচ তার নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে বারান্দার দিকে রওনা হল রহমানের জন্যে চা আনতে হবে। যে একটু আগে তাকে চড় খেতে দেখেছে। দেখে দাঁত বের করে হেসেছে।

ঊর্মি চা ঢালছে।

জাহানারা পাশের চেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। তিনি বিরস মুখে বললেন, কার চা?

রহমানের।

রহমানটা কে?

ইলেকট্রিশিয়ান।

ইলেকট্রিশিয়ানকে আবার চা-বিসকিট খাওয়াতে হচ্ছে? সোমা কোথায় গেছে। তুই জানিস না?

না, জানি না।

কাউকে কিছু না বলে গেল কোথায়?

ঊর্মি চা নিয়ে চলে গেল। বিজু এসে বলল, ফ্যান কেমন ঘুরছে দেখে যাও মা। বন- বন- ফন-ফন। ঘরে বাতাসের ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে।

জাহানারা বললেন, সোমা কোথায় গেছে জানিস?

না।

কাউকে কিছু না বলে কোথায় গেল?

বিজু চিন্তিত গলায় বলল, কখন গেছে?

দুপুর থেকে তো দেখছি না।

মাই গড।

দুজনের মনেই যে চিন্তা একসঙ্গে কাজ করল তা হচ্ছে—আগের জায়গায় ফিরে যায় নি তো? কাউকে কিছু না বলে যাওয়ার অর্থ তো একটাই। বিজু বলল, এক বার চট করে দেখে আসব প্রফেসরের বাসাটায় আছে কি না?

সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সন্ধ্যার মধ্যে যদি না ফেরে তখন না হয়.......

যদি দেখি ঐখানে আছে তখন কি করব?

জাহানারা কোনো জবাব দিলেন না।

সোমা দূরে কোথাও যায় নি। গিয়েছে তার চাচার বাসায়। একসময় বড় চাচা ছদরুদ্দিন তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঈদে নিজের মেয়েদের জামার সঙ্গে বাড়তি একটি জামা কেনা হত সোমার জন্যে। এক রাতের কথা সোমার পরিষ্কার মনে আছে, সে তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। বড় চাচা থাকেন সোবহানবাগে। রাত তিনটার দিকে হেঁটে হেঁটে সোবহানবাগ থেকে এখানে এসে উপস্থিত। তিনি সোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা অস্থির হয়েছে কাজেই খোঁজ নিতে এসেছেন।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ বদলায়, সোমার ধারণা, বড় চাচা অনেকখানি। বদলেছেন, তবু কিছুটা টান এখনো নিশ্চয়ই অবশিষ্ট আছে। তা বোঝা যায়। কড়ুই গাছ। নিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ হত। সোমা এ-বাড়িতে উপস্থিত বলেই হয় নি। বড় চাচা চুপ করে গেছেন।

ছদরুদ্দিন সাহেব দুপুরে ঘুমের আয়োজন করছিলেন। সোমাকে ঢুকতে দেখে উঠে বসলেন। কোমল গলায় বললেন, আয় মা, আয়।

সোমা বলল, বাসা খালি কেন বড় চাচা চাচি কোথায়?

ও তার ভাইয়ের বাড়িতে গেছে। ঘোট মেয়েটাও গেছে। বাকি সব আছে ঐ ঘরে, কি যেন করছে। আসবে। তুই এখানে বোস খানিকক্ষণ।

আপনি ঘুমুচ্ছেন ঘুমুন। আমি ওদের সঙ্গে গল্প করি। ঘুমটুম কিছু না, শুয়ে থাকি। বিরাট যন্ত্রণার মধ্যে আছি। এর মধ্যে ঘুম হয় না। কীসের যন্ত্রণা?

আসছিস যখন সবই শুনবি। সরচেয়ে বড় যন্ত্রণা কি শুনবি? সংসার অচল। একটা পয়সা রোজগার নাই। তোর চাচি যায়—ভাইদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কিছু আনে, ঐ দিয়ে সংসার চলে।

সোমা তাকিয়ে রইল। ছদরুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, মেয়েগুলো বড় হয়েছে–বিয়ে দেওয়া দরকার। একটা সম্বন্ধ আসে না। হাড় জিরজিরে শরীর। সম্বন্ধ আসবেই বা কেন? কোনো ছেলে চায় একটা কঙ্কাল বিয়ে করে বাড়িতে নিতে?

সোমা চুপ করে রইল। ছদরুদ্দিন বললেন, এমনিতে কঙ্কাল কিন্তু তেজ আবার সোল আনার ওপর দুই আনা-আঠারো আনা। মান-অপমানের যন্ত্রণায় কাছে যাওয়া যায় না।

মান-অপমান থাকা কি খারাপ চাচা?

অবশ্যই খারাপ। ভিক্ষুকের আবার মান-অপমান কি? ভিক্ষুক হচ্ছে ভিক্ষুক।

কী-যে বলেন চাচা।

কি বুলি মানে? আমার অবস্থা তুই জানিস? তোর চাচিরা টাকা-পয়সা দেওয়া বন্ধ করলে রাস্তায় ভিক্ষা করতে বের হব। সত্যি বের হব। তুই নিজের চোখে দেখবি।

চুপ করুন তো চাচা।

ছদরুদ্দিন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি সোমার ভালো লাগল না। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ চাউনি। চোখ দুটো বড় বেশি জ্বল-জ্বল করছে।

ছদরুদ্দিন বললেন, তোর খবর কিছু কিছু শুনলাম। তোর চাচি বলছিল। এইসব কি সত্যি?

কোন সব?

চলে এসেছিস না-কি?

হুঁ।

কেন?

সে অনেক কথা চাচা, বাদ দিন।

বাদ দেব কেন? বল সবকথা।

বলার মতো কিছু না।

মারধর করত না-কি?

সে-সব কিছু না। স্বভাব খুব খারাপ। আজেবাজে কাজ করে বেড়ায়। জেলে পর্যন্ত গেছে। কিছু কিছু তো নিশ্চয়ই জানেন।

আগে একটা বিয়েও না-কি করেছিল?

বাদ দিন চাচা।

এইরকম একটা লোকের সঙ্গে তোর বিয়ে হল কি করে?

এইসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না চাচা।

শয়তান শয়তান-চারদিকে শয়তান। মানুষের মুখোশপরা শয়তান। বুঝলি শয়তান........।

চাচা আমি ঐ ঘরে যাই, দেখি তিথিমিথিরা কি করছে।

কিছুই করছে না। তুই বোস এখানে–চা খাবি?

হ্যাঁ।

দেখি চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা, দেখা যাবে চায়ের পাতা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। এই সংসারে আর থাকা যাবে না। সংসার আমার জন্য না। ও তিথি, তিথি.... কানে শোনে না না-কি?

তিথি।

তিথি এসে দাঁড়াল। কিছু বলল না।

তোর সোমা অপাকে চা দে। খুটখাট শব্দ হচ্ছে কীসের?

ক্যারাম খেলছি।

এর মধ্যে ক্যারাম খেলাও চলছে? বা ভালো-খুব ভালো। খেল, আরাম করে ক্যারাম খেল। সব গুটি গর্তে নিয়ে ফেলে দে।

তিথি মুখ কালো করে চলে গেল। সোমা ছাড়া পেল সন্ধ্যার আগে-আগে। সারাক্ষণ তাকে বড় চাচার পাশে বসে থাকতে হল। বড় চাচা ক্রমাগত কথা বলে গেলেন যার বেশিরভাগই হচ্ছে হা-হুতাশ।

বুঝলি সোমা, আমি এখন হয়েছি কীটস্য কীট, গরুর ঘাড়ে ঘা হয় দেখেছিস? ঐ ঘায়ে একরকম সাদা-সাদা কৃমি হয়। আমি হচ্ছি ঐ কৃমি। তিথির মামারা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমি একজন খানসামা। এক দিন কি হয়েছে শোন, তিথির বড় মামার বাড়িতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি বিরাট মচ্ছব রাজ্যের লোকজন এসেছে। তিথির মামা আমাকে কী বলল জানিস? বলল দুলাভাই আপনি গাড়িটা নিয়ে যান ভালো দেখে কিছু দৈ-মিষ্টি নিয়ে আসুন। অবস্থা চিন্তা কর। আমি এখন হয়েছি বাসার চাকর। ঐদিকে এখন ভুলেও যাই না। ভয়েই যাই না। এখন যদি যাই তা হলে

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

বলবে—দুলাভাই আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে, এক বালতি পানি নিয়ে বাইরে যান তো, ড্রাইভার গাড়ি ধুচ্ছে ওকে একটু সাহায্য করুন। বিচিত্র কিছু না বলবেই। না বলে পারে না—ঐ গুষ্ঠিরে আমি চিনি....।

সোমা যখন উঠে এল তখন তার রীতিমতো মাথা ধরে গেছে।

বাসায় পা দেওয়ামাত্র সবাই এক বার করে বলল, কোথায় ছিলে? বড় চাচার বাসায় ছিল শুনে জাহানারা বললেন, ঐখানে যাওয়ার দরকার কি? সোমা বলল, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া চলছে—তোমরা যাচ্ছ না। ভালো কথা। আমি কেন যাব না?

বানিয়ে বানিয়ে যখন এক শ কথা বলবে তখন বুঝবি।

বলুক।

কিছু তো জানি না, তাই বলছিস বলুক। জানলে বলতিস না।

আমার জানার দরকার নেই মা।

তোর বড় চাচা এখন কি বলে বেড়াচ্ছে শুনবি?

থাক–বড় চাচা প্রসঙ্গ থাক।

রাতে খাবার সময় সোমা নিজেই আবার বড় চাচার প্রসঙ্গ তুলল। নিচু গলায় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বড় চাচার অবস্থা যে কত খারাপ সেটা তুমি জান?

সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, এইসব তোকে বলল—আর তুই বিশ্বাস করে চলে এলি?

বিশ্বাস করব না কেন?

বিজু বলল, ওঁর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করবে না। বিগ লায়ার। সপ্তাহে এক দিন ঐ বাড়িতে পোলাও হয়। তুমি তো এইখানেই আছ—প্রতি শুক্রবারে পোলাওয়ের গন্ধ পাবে। বড় চাচির ভাইরা বিরাট পয়সা করেছে। বোনের নামে ব্যাংকে টাকা-পয়সা জমা করে রেখেছে। মাসে মাসে যেন হাতে টাকা আসে এই জন্যে রেস্টুরেন্টের শেয়ার কিনে দিয়েছে।

তুই এত খবর পেলি কোথায়?

চোখ-কান খোলা রাখি এই জন্যে সব জানি। কোনো কথা যদি ভুল বলি গালে একটা চড় দিও। কিছু বলব না। দিব্যি বাড়ি দখল করে বসে আছে। মতলব খুব খারাপ। তবে আমি ছাড়ার লোক না। তিন মাসের মধ্যে গেট আউট করে দেব। যদি না করি তো আমার নাম বিজু না।

সোমা ভাত ছেড়ে উঠে পড়ল। বিজুর কথাবার্তা অসহ্য লাগছে। অল্প বয়সের একটা ছেলে কেমন ভুরু কুঁচকে বুড়োদের মতো কথা বলছে। এসব কি?

বিজু বলল, মা, দেখলে আপা কেমন আমাদের ওপর রাগ করে উঠে গেল? না জেনে, না শুনে, শুধু শুধু রাগ করলে হয়? বড় চাচার সম্বন্ধে লেটেস্ট ইনফরমেশন কী পেয়েছি শুনবে?

জাহানারা বললেন, থাক এইসব।

আহ্ শোন না মা। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এত দিন আমরা জানতাম বড় চাচা তাঁর দোতলাটা বিক্রি করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা সত্যি না। বিক্রির কথা বলে টাকা নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাগজপত্রে সই করেন নি, সবই মুখে মুখে।

সাইফুদ্দিন বললেন, বলিস কি তুই?

বিজু বলল, পাকা খবর বাবা। কোনো ভুলে নাই। এখন বড় চাচি বলছেনবাড়ি তো বিক্রি হয় নাই। বাড়ি ভাড়া অ্যাডভান্স নিয়েছি।

সাইফুদ্দিন খাওয়া বন্ধ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিজু বলল, এখন বাবা অবস্থাটা দেখ, নিজের অংশ তাঁর নিজেরই আছে, প্লাস আমাদের অর্ধেকটা তাঁর দখলে।

জাহানারা বললেন, এই খবর পেলি কবে?

অনেক আগেই পেয়েছি। তোমাদের কিছু বলি নি কারণ সিওর ছিলাম না। এখন সিওর হয়েছি।

আজ রাতটা এমনিতে ঠাণ্ডা। তার ওপর মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। অসহ্য গরমে জেগে থাকার কথা নয়, কিন্তু সোমা জেগে আছে। তার অনিদ্রা রোগ আজকের নয়, অনেক দিনের। বিয়ের পরপরই অসুখটা হল—সে জেগে আছে, পাশেই কামাল মরার মতো ঘুমুচ্ছে। মাঝে-মাঝে ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করছে এবং কথা বলছে। খুব উত্তেজিত ভঙ্গির কথা। যেন ভয়াবহ কোনো স্বপ্ন দেখছে। প্রথম দিকে ভয় পেয়ে সোমা কামালের গায়ে ধাক্কা দিত।

এই, এরকম করছ কেন? কী হয়েছে—এই।

কামাল সঙ্গে-সঙ্গে জেগে যেত তবে কিছুই বলত না, চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে থাকত। সোমা বলত, এরকম করছিলে কেন? কি স্বপ্ন দেখছিলে?

মনে নাই।

পানি খাবে? পানি এনে দেব?

দাও।

সোমা পানি এনে দেখত কামাল আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় কথা। উত্তেজিত ভঙ্গি। হো হো শব্দ। ভয়ে সোমা কাঠ। লোকটা এরকম করে কেন? আবার ডেকে তুলবে? পানি খেতে বলবে? এই মানুষটাকে তার গোড়া থেকেই পছন্দ হয় নি। বিয়ের রাতেই তার মনে হয়েছে এই মানুষটা অন্যরকম।

আশেপাশে সে যাদের দেখে এ তাদের মতো নয়। আলাদা। কি রকম আলাদা? সোমা ঠিক বুঝতে পারে নি। গোড়াতে অবশ্যি বোঝার চেষ্টাও করে নি। এই মানুষটাকে বোঝর জন্যে সারা জীবনই তো সামনে পড়ে আছে। এত তাড়া কীসের?

অবশ্যি বাসর রাতে লোকটির প্রতি সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। তাকে বিয়ে করবার জন্যে কৃতজ্ঞ। এই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কৃতজ্ঞ। সোমার কৃতজ্ঞ হবার কারণ ছিল। এই বাড়িতে কিংবা এই পাড়ায় সে আর থাকতে পারছিল না। তার সারাক্ষণ ইচ্ছা করত ছুটে পালিয়ে যেতে। এমন কোথাও যেতে, যেখানে একটি মানুষও তাকে খুঁজে পাবে না। কেউ আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলবে না—ঐ দেখ সোমা যাচ্ছে। কোন সোমা বুঝতে পারছে তো?

হুঁ হুঁ—ঐ সোমা।

দেখতে তো বেশ শান্তশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

শান্ত? তা শান্ত তো বটেই। হা-হা-হা। নিজে শান্ত চারদিকে অশান্ত।

আঠার বছর বয়স পর্যন্ত সোমাকে সবাই শান্ত মেয়ে, ভদ্র মেয়ে এবং খুবই লাজুক ধরনের মেয়ে বলেই জানত। পাড়ার অতি বখা ছেলেও তাকে দেখে কোনোদিন শিস দেয় নি, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নি। কিংবা করলেও সোমা শোনে নি। সোমা রাস্তায় বেরুত মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটত মনে হত আশেপাশে কেউ নেই, সে যেন একা জনশূন্য পথে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

একটা ক্ষুদ্র এবং প্রায় তুচ্ছ ঘটনায় সব বদলে গেল। সোমাদের বাড়ির তিনটা বাড়ির পর নারকেল গাছওয়ালা বাড়ির দোতলায় নতুন ভাড়াটে এল। এক প্রফেসর তাঁর সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে এবং অসুস্থ স্ত্রী। ভদ্রলোক প্রথম দিনেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে এল ট্রাক ভরতি বই। এত বই কারোর থাকে? বাড়িটাকে কি সে লাইব্রেরি বানাবে? মানুষগুলো থাকবে কোথায়? ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন এম্বুলেন্সে করে। এ-ও এক রহস্য। এম্বুলেন্স করে রুগীরা হাসপাতালে যায় এটাই জানা। এম্বুলেন্সে করে ভাড়া বাড়িতে থাকতে আসে এটা কারোর জানা ছিল না।

এক দুপুরে সোমা ভদ্রমহিলাকে দেখতে গেল।

মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে। প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত শরীর শুকিয়ে। কাঠি অথচ মুখটা ভরাট। চোখ জ্বল-জ্বল করছে। তার নাম অরুণা। তার স্বামী তাকে ডাকে অরু নামে এবং ডাকে খুব মিষ্টি করে।

ভদ্রমহিলা সোমার সঙ্গে তেমন কোন কথা বললেন না। কি নাম? কি পড়? বাসা কোথায়? এইটুকু জিজ্ঞেস করেই খুব সম্ভব ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রমহিলার স্বামী অনেক কথা বললেন। তাঁর নাম আশরাফ হোসেন। ফিলসফির অধ্যাপক। ভদ্রলোকের গলার স্বর মোটা। কথা বলার সময় চারদিক গম-গম করে, তবে কথা বলার মাঝখানে মাঝখানে হঠাৎ করে তিনি থেমে যান এবং কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।

আশরাফ সাহেব বললেন, তোমার কি নাম খুকি?

সোমা লজ্জিত গলায় বলল, সোমা।

সুন্দর নাম তো। বলতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? সোমবারে জন্ম নিশ্চয়ই? সোমবারে জন্ম হলে বাবা-মারা নাম রাখে সোমা। তোমার কি সোমবারে জন্ম?

জি।

কী পড়?

আই এস সি।

বাহ্‌, আমি আরো কম ভেবেছিলাম। বাচ্চা মেয়েরা আজকাল উঁচু-উঁচু ক্লাসে পড়ে।

সোমা কিছু বলল না। কেন জানি তার লজ্জা কিছুতেই কাটছে না।

তুমি কি গল্পের বই পড় সোমা?

অল্প-অল্প পড়ি।

অল্প অল্প পড়বে কেন? অনেক বেশি-বেশি পড়বে। বই যে মানুষের কত ভালো বন্ধু এটা বই পড়ার অভ্যাস না হলে বুঝতে পারবে না। আমার কাছে অসংখ্য বই আছে। গল্প-উপন্যাসই বেশি। এস তোমাকে দেখাই।

বইয়ের সংখ্যা, আলমারীতে সাজিয়ে রাখার কায়দা, ঘরের মাঝখানে পড়ার টেবিল সব দেখে সোমা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে বলল, সব বই আপনি পড়েছেন?

না, অনেক বই-ই আছে পড়তে ভালো লাগে নি, দু এক পাতা পড়ে রেখে দিয়েছি। এখন আগের মতো পড়ার সময়ও পাই না। শুধু কিনে যাচ্ছি। তোমার যদি কোনো বই পড়তে ইচ্ছা করে এখান থেকে নিয়ে যাবে। টেবিলের ওপর যে লাল খাতাটা দেখছ ওখানে নাম লিখবে। কি বই নিতে চাও তার নাম লিখবে। তারিখ দেবে। যেদিন ফেরত দেবে মনে করে ফেরত দেওয়ার তারিখও লিখে রাখবে। কি—নেবে কোনো বই?

সোমার বই নিতে ইচ্ছা করছিল না, তবু ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে মাথা নাড়ল।

নিজে পছন্দ করে নেবে, না আমি পছন্দ করে দেব?

আপনিই দিন।

তোমার বয়সী মেয়েদের দারুণ ভালো লাগবে, পড়তে পড়তে কাঁদবে এইরকম একটা বই তোমাকে দিচ্ছি তবে একটা জিনিস মনে রেখো সোমা, পাঠকের চোখ ভিজিয়ে দেওয়া কিন্তু একটা বইয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে বইটি নিম্নমানের।

সোমা বই নিয়ে চলে এল। বইটির নাম: শোন বরনারী সুবোধ ঘোষের লেখা। একটা বই পড়েই সোমার বইয়ের নেশা ধরে গেল। বইটা সে তিনবার পড়ল এবং তিনবারই ফুঁপিয়ে কাঁদল। ঐ বাড়ির ভদ্রলোককে তার মনে হতে লাগল ডাক্তার হিমাদ্রী। হিমাদ্রীর মতোই

কেমন যেন বিষ চেহারা ভদ্রলোকের। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন। এত ভালো লাগে দেখতে।

দুদিন পর পর লোমা বই আনতে যেত। বেশিরভাগ সময়ই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হত না। সোমা বই নিয়ে খাতায় নাম লিখে চলে আসবার সময় খানিকক্ষণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলত। ভদ্রমহিলা তেমন কিছু বলতেন না তাকিয়ে থাকতেন, মাঝে-মাঝে হা হু করে জবাব দিতেন। কথা বেশিরভাগই বলত সোমা।

আজ আপনার শরীর কেমন?

ভালো।

আপনার গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে না

একসময় করত, এখন করে না।

আপনার তো একটা হুইল চেয়ার আছে। হুইল চেয়ারে বসে এদিক-ওদিক গেলে নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে।

আমার ভালো লাগে না।

আপনার মেয়েটা এ-বাড়িতে বেশি থাকে না—তাই না?

ও তার মামার বাড়িতে থাকে। ওখানে ওর সমবয়েসী অনেকে আছে।

আমি যে প্রায়ই এসে বই নিয়ে যাই আপনি বিরক্ত হন না তো?

না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় দেখা হত ছুটির দিনে। দেখা হলে তিনি প্রথম যে কথাটা বলতেন তা হচ্ছে—তারপর সোমা, বইয়ের নেশা ধরিয়ে দিয়েছি তাই না?

হ্যাঁ দিয়েছেন।

আফিমের নেশার চেয়েও কড়া নেশা হচ্ছে বইয়ের নেশা। আফিমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু বইয়ের নেশা থেকে কোন মুক্তি নেই।

মুক্তি থাকবে না কেন? আপনি তো আর এখন পড়েন না। আপনার তো মুক্তি ঘটেছে।

মোটই না। এখনো কোনো বই হাতে নিলে শেষ না করে উঠতে পারি না। এই ভয়েই বই হাতে নেই না। হা-হা-হা। বস সোমা, তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।

সোমা বসে। ভদ্রলোকে বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলেন, আচ্ছা দেখি তোমার বুদ্ধি কেমন? বলতো বই পড়তে মানুষের ভালো লাগে কেন?

সোমা জবাব দিতে পারে না। চট করে কোন জবাব মাথায় আসে না।

আচ্ছা আরো সহজ করে বলছি, গান শুনতে মানুষের ভালো লাগে কেন? একটা সুন্দর ছবি দেখলে মানুষের ভালো লাগে কেন?

আমি জানি না।

জানি না কথাটা বলতে সোমার খুব লজ্জা করে। ভদ্রলোক তা বুঝতে পারেন।

এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এখন থেকে চিন্তা করবে। চিন্তাটা শুরু করবে কোথায় জান? শুরু করবে ভালোলাগা ব্যাপারটা কি? বিষয়টা বেশ জটিল। তবে জানা দরকার। শুধু খাওয়া এবং ঘুমের মধ্যে আমাদের জীবন না—এই জন্যেই এসব জানা দরকার। ভাববে, মন লাগিয়ে ভাববে একসময় দেখবে তোমার ভাবতেও ভালো লাগছে। এবং বুঝতে পারবে আমাদেরকে প্রকৃতি কত ঐশ্বর্য দিয়ে পাঠিয়েছেন।

সোমার অনিদ্রার অসুখ এই সময় প্রথম হল। কিছুতেই ঘুম আসতে চাইত না। জেগে জেগে অদ্ভুত সব কল্পনা করতে ভালবাসত। সেইসব কল্পনার একটি ছিল সোমার খুবই প্রিয়। কল্পনাটা এরকম—এক দুপুরে সোেমা বই আনতে যাচ্ছে। দুপুরটা আর সব দুপুরের মতো নয়, একটু যেন অন্যরকম। মেঘলা দুপুর। ঐ বাড়ির কাছাকাছি যেতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হল। সোমা দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে উঠতেই ঝড় শুরু হয়ে গেল।

ঐ বড়িতে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি অবাক হয়ে কললেন, কি ব্যাপার সোমা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, ইস ভিজে গেছ দেখি। যাও গামছা দিয়ে গা মোছ।

সোমা বলল, বাসায় কেউ নেই?

না। অরুণা মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের বাসায় গিয়েছে। কাজের মেয়েটাও সঙ্গে গেছে।

আপনি গেলেন না কেন?

আমার শরীরটা ভালো না–জ্বর।

বেশি জ্বর?

বেশি বলেই তো মনে হচ্ছে।

কই দেখি?

বলেই সোমা ভদ্রলোকের কপালে হাত রাখল। হাত রাখতেই তার শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল। মনে হল তার নিজেরই প্রচণ্ড জ্বর এসে যাচ্ছে। সোমা বলল, আমি নতুন একটা বই নিয়ে বাসায় চলে যাব। আপনি শুয়ে থাকুন।

পাগল। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাসায় যাবে কি? তুমি বরং একটা বই নিয়ে আসো। আমি শুয়ে তাকি তুমি পড়ে শোনাও।

সোমা তাই করল।

উনি সারা শরীর চাদরে ঢেকে শুয়ে আছেন। বই পড়তে পড়তে সোমার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সোমার দিকে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি। হাওয়ার তুমুল মাতামাতি। হঠাৎ.....

সোমার কল্পনা এই পর্যন্তই। বাকিটা সে আর ভাবতে পারে না। বুক ধড়ফড় করে। এই কল্পনাটা সে যতবারই করে ততবারই ঠিক করে রাখে আর কোনোদিন সে ঐ বাড়িতে যাবে না। কোনোদিন না, মরে গেলেও না। দিনের বেলা মনে হয়—আচ্ছা, আর একবার শুধু যাব। আর যাব না। শুধু একবার। বইটা শুধু দিয়ে চলে আসব। এই শেষবারের মত.......

জাহানারা একদিন বললেন, তোর চেহারা এমন খারাপ হয়েছে কেন? তোর কি কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে?

বুঝতে পারছি না।

তোর বাবাকে দেখিয়ে ওষুধ-টষুধ খা। তোর দিকে তো তাকানো যাচ্ছে না।

সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে দেখে টেখে বললেন, লিভারের কোনো সমস্যা। হজমে গণ্ডগোল হচ্ছে। একটা ডাইজেসটিভ এনজাইম দিচ্ছি। ওতেই কাজ হবে। আর শোন মা, তুই রাতদিন মুখের ওপর বই নিয়ে পড়ে থাকবি না, একটু হাঁটাহাঁটি করবি। এক্সারসাইজের দরকার আছে। খুব ভোরবেলা উঠে খানিকক্ষণ ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ করবি।

সেই সময় ঘটনাটা ঘটল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐদিনের দুপুরটা ছিল সোমার কল্পনার দুপুরের মতো মেঘলা-বাতাস ছিল মধুর। ঐ বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সোমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজল। যোক-সবকিছু কল্পনার মতো হোক।

ভদ্রলোকই দরজা খুলে দিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে? বাবা বইয়ের তো দেখি ভালো নেশা ধরে গেছে।

সোমা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বাসায় আর কেউ নেই।

তিনি বললেন, থাকবে না কেন? সবাই আছে। এসো। আজ দেখি শাড়ি পড়ে এসেছ। ভেরি গুড। শাড়ি হচ্ছে একটা এলিগ্যান্ট ড্রেস। এবং এই ড্রেসের সবচেয়ে বড় বিউটি কি জান?

জ্বি না।

পৃথিবীর অন্য সব ড্রেসের সমস্যা হচ্ছে একজনেরটা অন্যজনের গায়ে লাগে না। দরজি দিয়ে বানাতে হয়। শাড়িতে এই সমস্যা নেই। কি ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ ঠিক।

তুমি আজ এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বল তো? কি হয়েছে?

কিছু হয় নি।

জ্বর-জারি না তো?

জ্বি না।

সাবধান থাকবে। এখন খুব অসুখ বিসুখ হচ্ছে। এস আজ আমি নিজেই তোমাকে পছন্দ করে বই দেব। এস।

তারা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল।

ঘরটা এমনিতেই অন্ধকার অন্ধকার। আজ আকাশ মেঘলা থাকায় আরো যেন বেশি অন্ধকার লাগছে। সোমার কেমন যেন লাগছে। বুক শুকিয়ে কাঠ, অসম্ভব তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। খুব ইচ্ছে করছে মানুষটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে।

কি ব্যাপার সোমা এত ঘামছ কেন? তুমি বস তো এই চেয়ারটায় আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো না। দাঁড়াও ফ্যানটা ছেড়ে দিচ্ছি।

সোমা কাতর গলায় বলল, আমি বাসায় যাব।

তিনি বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আর ঠিক তখনি পাশের ঘর থেকে অরুণা তীব্র ও তীক্ষ্ণ গলায় চেচিয়ে উঠল, তোমরা ঐ-ঘরে কি করছ? তোমরা ঐ-ঘরে কি করছ? তোমরা দুজন ঐ-ঘরে কি করছ?

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকালেন সোমার দিকে। তারপরই শান্ত ভঙ্গিতে স্ত্রীর ঘরে ঢুকে ভারী গলায় বললেন, এরকম করছ কেন অরুণা? ছিঃ, এসব কি? আমার স্বভাব-চরিত্র তুমি জান না?

অরুণা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, আমি দেখেছি। আমি দেখেছি। আমি জানি তোমরা কি করছ। আমি জানি। আমি জানি।

কাজের মেয়েটি ছুটে এল। একতলার ভদ্রমহিলা ছুটে এলেন। পাশের ঘরের জানালা খুলে গেল। বাড়ির সামনের গেটে দুজন পথচারী থমকে দাঁড়ালেন। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো অরুণা চেঁচাচ্ছেন, আমি জানি, আমি জানি।

সোমা ছুটে বের হয়ে গেল।

এরকম ঘটনা এ-পাড়ায় অনেকদিন ঘটে নি। সাইফুদ্দিন সাহেবের বাসার সামনে দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। নিতান্ত অপরিচিত লোকজন দরজায় কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, মেয়েটাকে ওরা কি করেছে বলেন দেখি ভাই। ঐ হারামজাদার আমরা চামড়া খুলে ফেলব।

প্রফেসর সাহেবের ঐ দোতলা বাড়ির চারদিকে ছেলেপুলে জমে গেল। ঢিল পড়তে লাগল—সেই সঙ্গে কুৎসিত গালাগাল—তলে তলে ফুর্তি। রস বেশি হয়ে গেছে। আয় হারামজাদা রস বের করে দিই।

সন্ধ্যার পর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পাড়ায় পুলিশ চলে এল। সাইফুদ্দিন সাহেব সেই রাতেই মেয়েকে খালার বাড়ি টাঙ্গাইলের বড় বাসালিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। খালার সেই পাঁচিল ঘেরা বড়ি ছিল দুর্গের মতো। সোমার মনে হল এই দুর্গ থেকে কোনোদিন সে বেরুতে পারবে না। দু মাস পর সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। সোমার দিকে তখন তাকানো যায় না। চোখ বসে গেছে। মাথার সামনের দিকের চুল খানিকটা উঠে গেছে। কথা বার্তাও কেমন অসংলগ্নভাবে বলে।

জাহানারা মেয়েকে দেখে কেঁদে ফেললেন।

পাড়ার মেয়েরা রোজ দল বেঁধে আসে। নানান কথা বার্তার পর একসময় বলে, কৈ, মেয়ে এসেছে শুনলাম। মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছেন কেন? লুকিয়ে রাখার দরকার কি?

তারা নিজেদের মধ্যে চোখে-চোখে কথা বলেন। সেই চোখের ভাষা জাহানারা পড়তে পারেন। তিনি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন।

পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যেই আলোচনা করে, পেট নামিয়ে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায়। কোন আনাড়িকে দিয়ে কাজ করিয়েছে কে জানে-দেখেন না মেয়ের কি অবস্থা? প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিল।

একদিন সন্ধ্যায় সোমা কি জন্যে যেন বাইরের বারান্দায় গিয়েছে—দুটি ছেলে তাকে দেখে শিশুদের কান্নার নকল করে ওঁয়া ঔয়া করতে লাগল। সোমা মাকে গিয়ে বলল, মা, ওরা এমন করছে কেন? জাহানারা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তার পরেরদিন আবার তাকে টাঙ্গাইল পাঠিয়ে দেওয়া হল। জাহানারা তাঁর বোনকে লিখলেন—আপা, তুমি যেভাবেই পার

আমার এই মেয়েটাকে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। কানা, খোঁড়া, অন্ধ যাই হোক। তুমি এটা কর, আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি। আমার মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে এই মেয়ের কোনোদিন বিয়ে হবে না। আপা, তুমি আমাদের বাঁচাও।

পৌষ মাসে সোমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে টাঙ্গাইলে হল, খুব তাড়াহুড়ার বিয়ে বলে কাউকে খবর দেওয়া গেল না। বিয়েতে বাবা-মা কিংবা ভাই-বোনেরা কেউ আসতে পারল না।

বিয়েতে সোমা খুশিই হয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল বিয়ের রাতে কামালের ব্যবহারে। সে তার স্ত্রীকে বিয়ের রাতে কোনোরকম বিরক্ত করে নিহাই তুলে বলেছে, সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়। রাত থাকতে উঠতে হবে, দিনে-দিনে চিটাগাং পৌঁছাতে হবে। বিরাট যন্ত্রণা চিটাগাংয়ে ফেলে এসেছি। বিয়েটা তিনদিন পরে করলে আরাম করা যেত। বলেই লোকটা শুয়ে পড়ল। আর শোয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল। কোনো আদর না। কোনো গল্প না। ভালবাসার কোনো কথা না। সোমা সারারাত খাটের এক মাথায় কাঠ হয়ে বসে রইল। তার সারাক্ষণ ভয় ভয় করছিল—এইবুঝি লোকটা জেগে বলবে, এই এদিকে আসতো। লোকটার চোখে থাকবে অন্য ধরনের আহ্বান।

সেরকম কিছুই হল না।

খুব ভোরে ফার্স্ট বাস ধরে তারা চলে এল ঢাকায়।

কামাল বলল, চল তোমাদের বাসায় যাই। চা-টা খেয়ে গোসল-টোসল করে চিটাগাংয়ের বাস ধরি।

সোমা বলল, আমি বাবার বাড়িতে যাব না।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, যাবে না কেন?

ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলে দরকার নেই। জোর-জবরদস্তির কোনো ব্যপার না। জোর-জবরদস্তি আমার কাছে নাই।

দুই কামরার একটা বাসায় তাদের বিবাহিত জীবন শুরু হল। দামপাড়ায় বাসা। বাসার কাছেই মসজিদ। মাইক বাজিয়ে সারাদিন সেই মসজিদে ওয়াজ হয়। লোকটা দাঁত বের করে বলল, দিনরাত আল্লাহ-খোদার নাম শুনবে। নামাজ রোজা ছাড়াই সোয়াব হবে। বাসা পছন্দ?

সোমা পুরুষ-পুরুষ গন্ধের সেই ঘরের বিছানায় চুপচাপ বসে রইল। পছন্দ-অপছন্দের কিছুই তার তখন নেই। পৃথিবীর সবকিছুই তার পছন্দ আবার সবকিছুই তার অপছন্দ।

চা বানাতে পার? শিখেছ এইসব?

সোমা তাকিয়ে রইল। কি-রকম অমার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলছে লোকটা। এই কথাগুলো কি আরো সুন্দর করে বলা যায় না?

যাওচা বানাও, রান্নাঘরে জিনিসপত্র আছে। চা খেয়ে হেভি গোসল দিব। তারপরে দিব ঘুম। শালা ঘুম কারে বলে দেখবে। ঘুম নাম্বার ওয়ান। হা-হা-হা।

সোমা চা বানিয়ে আনল। লোটা হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে খালি গায়ে বসে আছে। দৃশ্যটা যে কি পরিমাণ কুৎসিত সে বোধহয় জানেও না।

লোকটা বলল, তোমার জন্য চা আনলে না?

আমি চা খাই না।

না খেলে কি আর করা। না খেলে নাই। বস আমার সামনে, দু একটা কথা বলি।

সোমা বসল।

লোকটা চুক চুক করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোমার কিছু সমস্যা আছে, আমি জানি। এও জানি সমস্যাটা ভালো না। সমস্যা আছে বলেই আমার মতো ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হল। আমি কচি খোকা না। আল্লাহতায়ালা আমাকে কিছু বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই জিনিস অনেককে তিনি দেন না। যাই হোক, এখন আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন। তোমার কি সমস্যা আছে আমি জানতে চাই না। হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে। গু কাটি দিয়ে ঘাঁটলে গন্ধ ছড়ায়। গন্ধের আমার দরকার নাই। তোমার যেমন কিছু সমস্যা আছে আমারও আছে। আগে একটা বিয়ে করেছিলাম। বিয়ে টিকে নাই। এই কথা তোমার

আত্মীয়-স্বজনেরে বলি নাই। আগ বাড়িয়ে সব কথা বলার দরকার কি? তুমি যদি জানতে চাও বলব। জানতে না চাইলে বলব না। তারপর ধর...

সোমা তার কথা শেষ করতে দিল না। কথার মাঝখানেই স্পষ্ট করে বলল, আমার কোনো সমস্যা নেই।

লোকটা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, কি বললে তুমি?

আমার কোনো সমস্যা নেই।

না থাকলে তো ভালো। কাছে আস।

সোমা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে গেল।

বস।

সোমা বসল।

লোকটা হাতের সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে খুবই সহজ ভঙ্গিতে সোমার বুকে হাত রাখল। সোমা কাঠ হয়ে গেল। লোকটা বলল, যাও জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।

সোমা তাকিয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে। না।

যাও জানালাগুলো বন্ধ কর। লজ্জার কিছু নাই।

সোমা উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করল। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এই মানুষটার সঙ্গে তার বাকি জীবন কাটাতে হবে? কেন? সে এমন কি অপরাধ করেছে?

সোমাদের ঢাকা পৌঁছানোর সাত দিনের দিন সাইফুদ্দিন সাহেব মেয়েকে দেখতে এলেন। মেয়ের ছোট্ট এবং গোছানো সংসার দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। জামাইয়ের জন্যে দামি একটা ঘড়ি এবং পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলেন। ঘড়ি এবং টাকা দিয়ে জামাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই বললেন যার তেমন কোন অর্থ নেই। কামাল নত মস্তকে সব শুনল এবং প্রতিবারই বলল, অবশ্যই। যা বলেছেন সবই খাঁটি কথা। একটাও ফেলে দেবার কথা না।

জামাইয়ের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর কাছে মনে হল—ছেলেটার বয়স একটু বেশি হলেও সে অতি নম্র, অতি ভদ্র।

ঢাকায় ফিরে আসার আগে সোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জামাই কি করে সেটাতো বুঝলাম না? ছেলে করে কি?

সোমা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

সাইফুদ্দিন সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কি?

কামাল তার শ্বশুরকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। সাইফুদ্দিন সাহেব ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তুমি কি কর ঠিক বুঝলাম না। ব্যবসা?

কামাল দাঁত বের করে হাসল। জবাব দিল না।

সাইফুদ্দিন সাহেব গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে ঢাকায় ফিরলেন। লম্বা চিঠি লিখলেন মেয়েকে। কোনো উত্তর পেলেন না। আবার লিখলেন, তার উত্তর নেই। তিনি আবার চিটাগাং গেলেন, সোমারা ঐ বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না।

বাড়িওয়ালা বলল, ঐ লোক আপনার কি হয়? বিরাট ফক্কড় লোক। তাকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়েছি। দু দিন পরে-পরে পুলিশ এসে খোঁজ করে। বাড়িটার বদনাম হয়ে গেছে।

সাইফুদ্দিন সাহেব মাটিতে বসে পড়লেন। পরের তিন মাস তিনি মেয়ে-জামাইয়ের কোনো খোঁজ বের করতে পারলেন না। তিন মাস পর খুলনা থেকে মেয়ের চিঠি পেলেন

বাবা,

আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়ে তোমরা দুশ্চিন্তা করবে না। ইতি,

তোমাদের
সোমা।

পুনশ্চ: মাকে সালাম দিও। বিজু এবং ঊর্মিকে আদর।

৬. কামালের চোখের অবস্থা খুব খারাপ

কামালের চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আগে মাঝে-মাঝে পানি পড়ত, এখন ক্রমাগত পড়ে। রোদে বের হলে যন্ত্রণা হয়। চিনচিনে ব্যর্থ হয়। ঘন কালো রঙের চশমা একটা সে কিনেছে। সেই চশমা চোখে দিলে দিনে-দুপুরে ঢাকা শহর অন্ধকার হয়ে যায়। কাউকে চেনা যায় না। এও এক যন্ত্রণা।

ঢাকা শহরে প্রতিটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটতে হয়। চিনে চিনে। পথ চলা। এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। পথ চলতে হচ্ছে অন্ধের মত। তার মতো মানুষের জন্যে এটা খুবই বিপজ্জনক।

একদিন দুপুরে গুলিস্তানের মোড়ে তাকে পিছন থেকে কে যেন ডাকল, কে কামাল সাহেব না?

এইসব ক্ষেত্রে কামাল কখনো মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায় না। দ্রুত সরে পড়তে চেষ্টা করে। সেদিনও তাই করল। প্রায় লাফ দিয়ে চলন্ত একটা বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা তার দিকে ফিরতেই বলল, তাড়াতাড়ি যাও। পিজি। পেটে ব্যথা উঠেছে। মরে যাচ্ছি।

বেবিট্যাক্সিওয়ালা ঝড়ের গতিতে বেবিট্যাক্সি পিজিতে নিয়ে এল। কামাল ভাড়া মিটিয়ে শিশুপার্কের দিকে হাঁটা ধরল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা তাকিয়ে রইল হতভম্ব হয়ে। পেটে ব্যথার রুগী শিশুপার্কে যায় কেন?

ঢাকা শহরে কামালের চেনা লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এটা তার জন্যে খুবই খারাপ। বছর চারেকের জন্যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথায়ও চলে যাওয়া দরকার। মুশকিল হচ্ছে যেতে ইচ্ছা করছে না। আলস্য এসে গেছে। বেশিরভাগ সময় এখন সে ঘরেই থাকে। খবরের কাগজ পড়ে। ঘুমায়। কিছু জমা টাকা আছে, এইগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এইভাবেই থাকবে। ঝামেলায় যেতে ইচ্ছা করে না। রোজ সন্ধ্যাবেলা সোমার জন্যে তার কেন জানি খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, মেয়েটা বড় ভালো ছিল। আমার সঙ্গে থেকে খুব কষ্ট করে গেল।

৭. সোমার কেমন যেন শীত শীত লাগছে

সোমার কেমন যেন শীত শীত লাগছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়। ফ্যানের শো-শোঁ শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বিজু ফ্যানটা ভালো কেনে নি। এত শব্দ হবার তো কথা না।

সোমা উঠে বসল।

পাশের খাটে ঊর্মি। কেমন এলোমেলল ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ঊর্মির জীবনটা কেমন হবে কে জানে! এই ব্যাপারটা আগেভাগে জানা থাকলে ভালো হত। নিজেকে প্রস্তুত করে রাখা যেত। পৃথিবী বড় রহস্যময় জায়গা। সব রহস্যে ঢাকা। আগে থেকে কিছুই জানা যায় না।

স্যান্ডেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সোমা খালি পায়েই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি পড়ছে ঠিকই। বিজু শুয়েছে বারান্দায়। বৃষ্টির ছাট লাগছে গায়ে। তবু ঘুম ভাঙছে না। সে এসে বিজুকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। নিজের ঘর ছেড়ে বেচারাকে ঘুমুতে হচ্ছে বারান্দায়।

সোমা ডাকল, এই বিজু।

বিজু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, কি আপা?

জেগেছিলি নাকি?

হুঁ।

বৃষ্টিতে ভিজছিস তো, ভেতরে গিয়ে ঘুমো। আমি ঊর্মির সঙ্গে শোব।

দু এক ফোঁটা পানিতে আমার কিছু হয় না আপা।

বলতে বলতে বিজু মশারির ভেতর থেকে বের হয়ে এল। হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বের করল। সোমা তাকিয়ে আছে। কত ছোট দেখেছে তাকে। ঘরময় হামাগুড়ি দিত। একটু পর পর বলত হাঁউ। এই ছেলে বয়স্ক লোকের ভঙ্গিতে মুহূর্তে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ে।

আপা।

কি।

এ বাড়িতে রাতে তোমার ভালো ঘুম হচ্ছে না—তাই না?

হবে না কেন, হয়।

একটু পর-পর বিছানা থেকে ওঠে। পানি খাও। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর। আবার গিয়ে শোও।

তুই এতসব দেখিস কখন? জেগে থাকিস?

হুঁ।

তোরও ঘুম হয় না?

হয়। তবে কম হয়। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান চিন্তা করি।

কি চিন্তা-ভাবনা? দ্রুত কীভাবে বড়লোক হওয়া যায়।

এখনি মাথায় এই চিন্তা?

হুঁ। এখনি। এবং দেখবে আমি হয়ে ছাড়ব। পুতু-পুতু লাইফ অসহ্য। বি এ পাশ করে পড়াশোনা স্টপ করে দেব। তারপর..

তারপর কি?

এখন বলব না। আছে অনেক পরিকল্পনা। প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে—বড় চাচার উচ্ছেদ। কীরকম কায়দা করে এটা করি সেটাই শুধু দেখো।

ছিঃ বিজু ছিঃ।

বিজু কোনো উত্তর করল না। নিজের মনে হাসল। সোমা বারান্দায় রাখা চেয়ারে বসল। বৃষ্টি দেখতে তার ভালো লাগছে।

চা খাবে নাকি আপা? ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে পার। দেব?

দে।

বিজু উঠে চা ঢালল। আপার জন্যে এবং তার নিজের জন্যে।

আপা।

বল।

ঐখানে তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আর তোমাকে কষ্ট করতে দেব না। তোমার ঝামেলাটা যখন হয় তখন আমি ছোট ছিলাম। আমার বয়স একটু বেশি হলে ঘটনা অন্যরকম হত।

তুই বিরাট দায়িত্ববান হয়েছিস মনে হয়।

হ্যাঁ হয়েছি। তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক দায়িত্ববান কিন্তু হয়েছি। বিজু চুপ করে গেল। সে বৃষ্টি দেখছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে বারান্দায় উঠেছে। এখন ঢুকতে চাচ্ছে। বিজু তা দেখেও চুপ করে আছে। সোমা মৃদু গলায় বলল, বিজু।

বল।

ঐ প্রফেসর সাহেব কি এখন আছেন? মানে ঐ যে......

জানি কার কথা বলছ। হ্যাঁ আছেন।

ঐ বাড়িতেই?

হুঁ।

কেমন আছেন—তুই কিছু জানিস?

ভালেই আছেন। খারাপ থাকবেন কেন। তবে বেচারার বৌ মারা গেছে।

কবে?

তা প্রায় দুই বছর। মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলার পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেল। গলায় মাইক লাগিয়ে রাতদিন চেঁচাত। কানে আঙুল দিতে হয় এমন সব গালাগালি। বিশ্রী অবস্থা।

সোমার খুব ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করতে-ভদ্রলোক কি আবার বিয়ে করেছেন।

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগছে। বিজু কি মনে করবে কে জানে।

ভদ্রলোক কি আবার বিয়ে করেছেন?

বিজু কঠিন স্বরে বলল, না।

ব্যাঙটা এখনো লাফালাফি করছে। বিজু তার চায়ের কাপের গরম চা ব্যাঙটার উপর ঢেলে দিল।

৮. দোতলা বাড়িটা আগের মতোই আছে

দোতলা বাড়িটা আগের মতোই আছে।

নারিকেল গাছ দুটি বড় হয়েছে। আগে যেখানে ফুলের বাগান ছিল সেখানে টিনের ছাদ দেওয়া গ্যারাজ। বাড়ির পাঁচিল ভেঙে আরো উঁচু করা হয়েছে। এছাড়া সব আগের মতো।

সোমা গেট দিয়ে ঢুকে একটু ইতস্তত করতে লাগল। সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া কি ঠিক হবে? শোভন হবে? একতলায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলে জিজ্ঞেস করা যেত প্রফেসর সাহেব কি আছেন? একতলার বাসিন্দাদের জানার কথা না প্রফেসরআছেন কি নেই, তবু জিজ্ঞেস করা।

সোমা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। এক বার শুধু মনে হল, কেন সে যাচ্ছে? মনের ভেতরের সেই প্রশ্ন তাকে কাবু করেই ফেলত যদি না দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কাজের মেয়েটি না নামত। খালি বালতি হাতে সে নামছে। সোমাকে দেখে বলল, কারে চান। আফা?

প্রফেসর সাহেব কি আছেন?

জ্বি আছেন। একটু আগে দেখছি।

কাজের মেয়েটি তাকিয়ে আছে। তার চোখের সামনে থেকে নেমে চলে যাওয়া যায় না। সোমা দরজার কলিং বেলে হাত রাখল।

দরজা খুলল।

সোমা শুকনো গলায় বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক ভারি গলায় বললেন, এস সোমা। এস।

সোমার পা যেন মেঝেতে আটকে গেছে। সে নড়তে পারছে না। ভদ্রলোক চশমার ভেতর দিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বয়স তাঁর মধ্যে তেমন ছাপ ফেলতে পারে নি। শরীর একটু ভারি হয়েছে। কানের কাছের কিছু চুল রুপালি হয়ে গেছে। এতে তাঁকে আরো যেন সুন্দর দেখাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে আছ কেন সোমা? এস ভেতরে এস।

আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

কেন চিনতে পারব না বল তো? তুমি তো বদলাও নি। আগের মতো আছ। তোমার বয়স বাড়ে নি। এখন খুকির মতোই লাগছে। বস, এখানে বস।

আজ যাই। অন্য একদিন আসব।

সোমা বসতে-বসতে বলল, বাসায় কেউ নেই?

কাজের একটা ছেলে এসেছে। কি যেন আনতে গেছে। এসে পড়বে। ও এলেই তোমাকে চা দেব।

আপনার মেয়ে কোথায়?

ওকে মেয়েদের ক্যাডেট কলেজে দিয়েছি। ময়মনসিংহ। জান বোধহয়।

হ্যাঁ জানি।

একটু বস, আমি সিগারেট নিয়ে আসি। আগে সিগারেট খেতাম না। এখন হয়েছি চেইন স্মোকার।

উনি সিগারেট আনতে অনেক দেরি করলেন। সোমা একা একা বসে রইল। আশ্চর্য! এই বাড়ির বারান্দায় একা একা বসে থাকতে খারাপ লাগছে না।

সোমা।

জ্বি।

তোমার কথা প্রায়ই ভাবতাম। তুমি আমার স্ত্রীর উপর কোন রাগ রেখ না। ওর মাথার ঠিক ছিল না।

আমি জানি।

দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই অবস্থা হল। ঐদিন তোমার জন্যে যে কি খারাপ লেগেছে......

ঐ-সব বাদ দিন।

বাদ দিতে পারলে তো ভালোই হত। কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। সব থাকে।

সোমা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

তিনি বললেন, তোমার খবর আমি সবই রেখেছি। অবশ্যি কখনো কোনোরকম যোগাযোগের চেষ্টা করি নি। ইচ্ছা করেই করি নি। এমনিতেই যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে। আমি আর তা বাড়াতে চাই নি।

সোমা কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, আপনার লাইব্রেরি আগের মতোই আছে?

আছে। বই অনেক বেড়েছে। আগে বই পড়ার সুযোগ হত না। এখন সুযোগ পাই। প্রচুর পড়ি। ঠিক তুমি আগের মতো আসবে। এসে বই নিয়ে যাবে। এস আমার সঙ্গে বই দিয়ে দিই।

আজ থাক। আরেক দিন এসে নেব। আজ বই নিতে ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করছে না কেন?

আমার বই পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর বই পড়তে ভালো লাগে। না।

তিনি সোমার সঙ্গে-সঙ্গে একতলায় নেমে এলেন। সোমা বলল, আপনাকে আসতে হবে না, আপনি কেন কষ্ট করছেন।

তিনি হাসিমুখে বললেন, একটু কষ্ট না হয় তোমার জন্য করলাম। তুমি তো আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ। করনি?

রাস্তায় নেমেই সোমা লক্ষ করল বিজু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সোমার চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিজু চোখ নামিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করল। বিজুর হাতে সিগারেট। সে আধ-খাওয়া সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তার মুখ গম্ভীর। থুথু করে সে কয়েক বার থুথু ফেলল।

৯. খাটের নিচে মিউ-মিউ শব্দ

খাটের নিচে মিউ-মিউ শব্দ হচ্ছে। রাতে কামালের ঘুম সচরাচর ভাঙে না। আজ মিউ-মিউ শুনে ঘুম ভাঙল। বিড়াল নির্ঘাত বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। শালি তা হলে খালাস হয়েছে। কামাল খাট থেকে নেমে বাতি জ্বালালউঁচু সুরে ডাকল, মিনু ও মিনু। কেউ সাড়া দিল না। কারণ মিনু বাড়িতে নেই। আজ সন্ধ্যায় তাকে কামাল নিজেই তার খালার বাড়িতে রেখে এসেছে।

ও মিনু।

কামাল খাটের নিচে উকি দিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেয়াশলাই কাঠি জ্বালাতেই বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখ নজরে এল।

ঐ বেটি, এবার কটা?

বিড়াল বিরক্ত স্বরে মিউ করল। রাতদুপুরে এই জ্বালাতন আর সহ্য হচ্ছে না।

কামাল বলল, সর না একটু দেখি। দেখি বাচ্চাগুলোকে।

বিড়াল কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? সে সত্যি-সত্যি সরে দাঁড়াল। ইদুরের মতো চারটা ক্ষুদে-ক্ষুদে বাচ্চা। চারটাই ধবধবে সাদা। চোখ ফোটে নি।

কামাল ওয়াড্রবের ওপর থেকে টর্চ লাইট নিয়ে এসে ধরল। কি সুন্দরই না লাগছে। বাচ্চাগুলোকে। এখন চোখ ফোটে নি। এক জন গড়িয়ে অন্য জনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। মা বিড়ালটা তখন বিরক্ত মুখে মিউ করছে।

কামাল আবার ডাকল, সোমা ও সোমা। তখন মনে পড়ল সোমা নেই। মনটা একটু খারাপ হল। আনন্দের জিনিস একা-একা ভোগ করা যায় না। কাউকে পাশে লাগে। কামাল পিরিচে দুধ ঢেলে এগিয়ে দিল। দরাজ গলায় বলল, খা বেটি, বেশি করে খা। বিড়ালটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় পিরিচের দুধে জিভ ভেজাল। মানুষটা এত করে বলছে না খেলে ভালো দেখায় না এরকম একটা ভাব।

কামাল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাত বেশি বাকি নেই। আবার ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। ভরে উঠে মানিকগঞ্জ যেতে হবে। একটা পার্টি পাওয়া গেছে। খোঁজ এনেছে। মোশতাক আলি। মোশতাক আলি লোকটা বদের হাড়ি, অন্য কোনো মতলব আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। মতলব থাকা বিচিত্র নয়। মানিকগঞ্জে যাওয়াটা ঠিক হবে কি-না কে জানে। কামাল বারান্দায় চেয়ারে এসে বসল। তার সামনেই ফুলের টবে-টবে বগনভিলিয়া। লাল-লাল পাতা ছেড়েছে। রাতে অবশ্যি কেমন কালচে দেখায়, কিন্তু দিনে অপূর্ব লাগে। টব দুটো সোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। দুটো কেন, সবগুলোই পাঠিয়ে দিলে হয়। বেচারির শখের জিনিস। একটা ঠেলাগাড়ি ডেকে ঠিকানা দিয়ে দিলেই হয়। ঘর তো এমনিতেই খালি করতে হবে। একা মানুষ, এরকম বাড়ি নিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সব বিক্রি-টিক্রি করে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেই হয়। এতে কাজকর্মের সুবিধা। চট করে হোটেল বদল করা যায়। বাড়ি তো আর চট করে বদল করা যায় না। চিঠিপত্রের জন্যে সে অবশ্যি জি পি ও পোস্টবক্স ব্যবহার করে। পোস্ট অফিসের এই ব্যবস্থাটা ভালো।

কামাল নিজেই চা বানিয়ে আনল। বানাতে বানাতে চা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মেয়েরা চা বানালে এত দীর্ঘ সময় গরম থাকে কি করে কে জানে।

ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে কামাল ভাবতে লাগল মানিকগঞ্জে যাওয়াটা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না। মানিকগঞ্জ না গেলে অনেকগুলো কাজ শেষ করা যায়। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ অনেক দিন নেওয়া হয় না। খোঁজ নেওয়া দরকার। ঢাকায় তার আত্মীয় আছে তিন জন। তার বড় বোন, ভাবি এবং ছোট মামা। আরেক বোন আছে বগুড়ায়। এদের সবাইকেই সে মাসে-মাসে নিয়মিত টাকা দেয়। কামালের টাকাটা তাদের খুবই দরকার। ছোট মামা তাদের দুই ভাই এবং দুই বোনকে নানান দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও নিজের কাছে রেখেছেন। বোনদের বিয়ে দিয়েছেন। এখন বিপাকে পড়েছেন। ছেলেপুলে সব কটা অপদার্থ হয়েছে। ছোট মামাকে টাকা না দিয়ে সাহায্য করলে বিরাট অধর্ম হবে। আর বড় ভাবি, কামাল টাকা না পাঠালে না খেয়ে থাকবেন। চারটা বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়েছেন, এখন আছেন তার বনের বাসায়। বোন এবং বোনের জামাই যে তাদের বের করে দিচ্ছে না তার কারণ কামালের পাঠানো টাকা। কামাল ভালো করেই জানে যেদিন সে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবে সেদিনই তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। সোজা হিসাব। বোন দুজনের মধ্যে বগুড়ায় যে আছে তার অবস্থা ভালো। তবু তাকে মাঝে-মাঝে টাকা পাঠাতে হয়। বগুড়ার বোন হচ্ছে। সবচেয়ে ছোট। বড় ভাইয়ের একটা দায়িত্ব থেকেই যায়। তা ছাড়া সবাই যখন পাচ্ছে, সেই বেচারি একা বাদ যাবে কেন?

শেষ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ যাবার পরিকল্পনা সে বাদ দিল। খবরের কাগজের কাজটা সেরে ফেলা যাক। শুধু-শুধু দেরি হচ্ছে।

দুটি দৈনিকে সে বিজ্ঞাপন দিল। সব জিনিসের দাম বাড়ছে, সামান্য কয়েকটা শব্দের বিজ্ঞাপনে সাত শ আঠার টাকা বের হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনটা এরকম।

জমি বিক্রয়

ঢাকার অদূরে ১১ কাঠার একটি প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হইবে। উঁচু জমি। এই মুহূর্তে বাড়ি করা যাইবে, তবে জমিতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লোনের জটিলতা আছে। যোগাযোগ করুন

সালামত শেখ, জিপিও বক্স নং-৬১৩

বিজ্ঞাপনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সামান্য জটিলতা। সামান্য জটিলতার লোভ লোকজন যোগাযোগ করবে। এদের মাঝখান থেকে এক জনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হবে। দেশটা ভর্তি বুদ্ধিমান গাধায়। কাঁঠাল ভাঙা হবে ওদেরই কারোর মাথায়।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা কামাল বাতিল করে দিল। ইচ্ছা করছে না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক কম থাকাই ভালো। সম্পর্ক কম থাকলেই টান থাকবে। সবসময় গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে রাখলে টান থাকে না। এটা হচ্ছে। জগতের নিয়ম। ছোট মামার কাছে অবশ্যি তার যেতে ইচ্ছা করছে। তবে নানান কারণেই যাওয়াটা ঠিক হবে না। বয়স বাড়ায় ছোট মামার প্যাচালপাড়া স্বভাব হয়েছে। সব জিনিস নিয়ে প্যাচাল পাড়বে। সোমা চলে গেল কেন এই প্রসঙ্গ উঠলে প্যাচাল পাড়তে পাড়তে মাথা ধরিয়ে দেবে।

চলে গেল কেন? তুই কি করেছিলি?

আগের বৌটাও তো চলে গেল।

বাচ্চাকাচ্চা থাকলে তো এরকম হত না।

তোর বাচ্চা হয় না কেন? অসুবিধাটা কি? এক জন ডাক্তার দেখা। পীর-ফকিরের কাছে যা।

এক লক্ষ কথা বলবে। কথা আর উপদেশ। নিজের ছেলেকে উপদেশ দিয়ে কিছু করতে পারল না আর সে হল গিয়ে ভাগ্নে। বুড়ো হয়ে গেলে সত্যি-সত্যি ভীমরতি হয়। খালি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করে। মামাকে এইবার বলতে হবে- মামা, উপদেশ খাতায় লিখে আমাকে দিয়ে দিও। অবসর সময়ে পড়ব। মুখে প্রত্যেক বার বল—কষ্ট হয়।

কামাল দুপুরে দুটা খবরের কাগজ কিনে হোটেলে খেতে গেল। খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে বেশ ইন্টারেস্টিং কেইস পাওয়া যায়। আজকের কাগজে তেমন কিছু ছিল না, তবে এক জন বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেকেন্ডহ্যান্ড মিউজিক সেন্টার কিংবা ক্যাসেট ডেক কিনতে চায়। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে—এই ব্যাটাকে একটু খেলিয়ে দেখা যেতে পারে।

কামাল বিকালে টেলিফোন করল।

ভাই আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। ক্যাসেট ডেক একটা আমার কাছে আছে।

ওপাশ থেকে আগ্রহের সুর শোনা গেল।

কোন কোম্পানি সেটা তো ভাই বলতে পারব না। প্যাকেট খোলা হয় নি। ব্রান্ড নিউ জিনিস।

তা হলে তো হবে না, আমি চাচ্ছিলাম সেকেন্ডহ্যান্ড যাতে কি-না কম দামে,ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া তো সম্ভব না। তাহলে তো দোকান থেকেই কিনতাম। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব কেন?

সেকেন্ডহ্যান্ডের কমে পাবেন—চোরাই মাল।

চোরাই মাল মানে?

স্মাগলড করা জিনিস।

ও, আই সি।

দশ হাজারে দিয়ে দিতে পারি, জিনিসটা নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি। আমার টাকার দরকার।

কোন কোম্পানির?

বললাম তো ভাই আমি জানি না।

আমি কি এসে দেখতে পারি?

আপনার আসার দরকার নাই। আমি বাসায় এসে আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

তা হলে তো খুবই ভালো হয়। এখন আনতে পারবেন?

এখন পারব না। পরশু দিন নিয়ে আসব। আপনার অ্যাড্রেসটা বলেন।

কামাল অ্যাড্রেস লিখে নিল। এই পার্টিকে শেষ পর্যন্ত ধরা হবে কি-না এটা পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে। এক দিন সময় আছে, তাড়া নেই। কামাল হোটেল দেখতে বের হল। সস্তার মধ্যে ভালো হোহাটেল। এত দিন বাড়িতে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। হোটেল খুঁজতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় কি? মানুষের ইচ্ছার উপর তো আর দুনিয়া চলে না। দুনিয়া চলে তার নিজের নিয়মে।

চোখ জ্বালা করছে। এই আরেক যন্ত্রণা হল চোখ নিয়ে। ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না।

১০. সন্ধ্যাবেলা সোমা চা বানাচ্ছিল

সন্ধ্যাবেলা সোমা চা বানাচ্ছিল। ঊর্মি এসে বলল, আপা একটু বাইরে যাও তো।

সোমা বলল, কেন?

কে যেন এসেছে। তোমাকে চাচ্ছে।

সোমা পাংশু মুখে উঠে দাঁড়াল। আচমকা বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। উনি কি এসেছেন?

বসতে বলেছিস?

না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

বসতে বললি না কেন? বসতে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারি নি।

তুমি গিয়ে বল।

সোমা বাইরে এসে দেখে উনি আসেন নি। কামাল দাঁড়িয়ে। সোমা শুকনো গলায় বলল, কি ব্যাপার?

আধা ঘন্টা ধরে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছি। বাসা চিনতে পারছি না। অথচ এর আগে তিন বার এসেছি।

এখানে দরকারটা কি?

দরকার নাই কিছু, তোমার টব দুটা নিয়ে আসলাম। রেখেছি ঐ কোণায়। লাল রঙের পাতা ছেড়েছে। আমার ধারণা ছিল এই গাছগুলো ফাল্গুন মাসে পাতা ছাড়ে, এখন ছাড়ল কেন বুঝলাম না।

সোমা বিরক্ত গলায় বলল, এগুলো আমার দরকার ছিল না।

বাসা ছেড়ে দিচ্ছি তো। না এনে করব কি? হোটেলে গিয়ে উঠব। একা মানুষ।

সোমা কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, তোমার জন্যে হোটেলে থাকাই ভালল। ঘন ঘন বদলাতে পারবে।

তা ঠিক। তোমাকে এমন রোগা লাগছে কেন? অসুখ বিসুখ না-কি?

না অসুখ বিসুখ হবে কেন?

খুব রোগা লাগছে এই জন্যে বলছি।

আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তোমার চিন্তিত হবার দরকার আছে কি?

সোমা লক্ষ করল লোকটা লজ্জা পেয়ে কেমন বিব্রত ভঙ্গিতে হাসছে। এই লোক বিব্রত ভঙ্গিতে হাসতেও পারে না-কি? আশ্চর্য তো!

কামাল পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বিড়ালটা বাচ্চা দিয়েছে। চারটা বাচ্চা। তিনটা খুব হেলদি। আর রোগা যেটা ঐটাকে তার মা দুধ খেতে দিচ্ছে না। ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। আদর-যত্ন এটাকেই করা উচিত, অথচ.....

সোমা চুপ করে রইল। কি বলবে সে? ভাগ্যিস বিজু বাসায় নেই। বিজু থাকলে নির্ঘাত হৈ চৈ চেঁচামেচি শুরু করত।

বুঝলে সোমা, আমি ন্যাকড়ায় দুধ ভিজিয়ে ঐ বাচ্চাটার মুখের সামনে ধরেছিলাম, এক বার শুধু চুক-চুক করে খেয়েছে। এখন আর খাচ্ছে না। বিরাট প্রবলেম।

আমাকে এসব বলছ কেন? ফুলের টব দিতে এসেছিলে, দেওয়া হয়েছে। এখন চলে যাও।

কামাল নিচু গলায় বলল, তুমি চলে আসায় খুব খারাপ লাগছে। এতটা খারাপ লাগবে বুঝতে পারি নি।

কিছুদিন খারাপ লাগবে তারপর আর লাগবে না।

তা ঠিক, নিজের বাপ-মার কথাই এখন আর মনে হয় না। সোমা তা হলে যাই।

আচ্ছা-যাও।

তোমাদের বাসার সামনে একটা গাছ ছিল না, বিরাট গাছ। কেটে ফেলেছ না-কি?

হ্যাঁ।

উচিত হয় নি। গাছ কাটা ঠিক না। যাই তা হলে সোমা। ইয়ে, শোন—একদিন এসে কি বিড়ালগুলোকে দেখে যাবে?

না। কেন শুধু কথা বাড়াচ্ছ।

আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে যাই।

যাই বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল। সোমা বলল, চোখের অবস্থা তো মনে হচ্ছে খুব খারাপ। ডাক্তার দেখিয়েছ?

না।

না কেন?

যাব একদিন। সব শালা ফক্কড়। যেতে ইচ্ছে করে না।

সবাই ফক্কড়। আর তুমি হচ্ছ ভালো মানুষ?

না। তা না।

যাও, চলে যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আচ্ছা তা হলে যাই।

কামাল যাচ্ছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। ওকে ডেকে বসিয়ে এক কাপ চা খাইয়ে দিলে খুব কি অন্যায় হয়? হা হয়। কেন শুধু শুধু চা খাওয়াবে?

সোমা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে গেল।

জাহানারা কঠিন স্বরে বললেন, ও এসেছিল কেন?

ফুলের টব দিতে এসেছিল।

সাহস তো কম না। ছোটলোক।

সোমা শান্ত স্বরে বলল, কেন শুধু গালাগালি করছ মা। গালাগালির দরকারটা কি তা তো বুঝছি না।

তোর কাকারখানা তো কিছু বুঝছি না। এত কি কথা তোর?

আমার কোন কথা নেই মা। ওর কিছু কথা ছিল শুনেছি। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তো বের করে দিতে পারি না।

ওর কি কথা ছিল?

তেমন জরুরি কিছু না। বিড়াল চারটা বাচ্চা দিয়েছে এইটাই বলল।

জাহানারা অবিশ্বাসী গলায় বললেন, বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে এই খবর দেবার জন্যে এখানে এসেছে?

হ্যাঁ। পাগল না-কি?

হ্যাঁ মা পাগল। পাগলের সঙ্গে থেকে-থেকে আমিও খানিকটা পাগল হয়ে গেছি। কারণ ঐ শয়তানটার জন্য আমার খারাপ লাগছে।

সোমার গলা কেমন যেন ভারি শোনা গেল।

সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। না নিজের ঘরে নয়। এই বাড়িতে তার নিজের কোনো ঘর নেই। একলা হতে ইচ্ছা করলেও এ-বাড়িতে সে উপায় নেই। অথচ এখন তার একা থাকতে ইচ্ছা করছে। সোমা হাত বাড়িয়ে চা নিল।

১১. ছদরুদ্দিন সাহেব খাটে আধশোয়া হয়ে বসা

ছদরুদ্দিন সাহেব খাটে আধশোয়া হয়ে বসা। তাঁর সামনের চেয়ারে বিজু। বিজুর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠি করা। ঘরে আর কেউ নেই তবে তিথি মাঝে-মাঝে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে। তিথির চোখে ভয়।

ছদরুদ্দিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, তুই আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছিস?

বিজু কঠিন গলায় বলল, হ্যাঁ। দশ দিনের মধ্যে চলে যাবেন।

দশ দিনের মধ্যে চলে যাব?

হ্যাঁ, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। বড় আপার ঘুমাবার জায়গা নেই। আমি ঘুমাই। বারান্দায়। বিশ্বাস না হলে এক বার এসে দেখে যাবেন।

সোমাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিলেই হয়। তিথির সাথে থাকবে।

বড় চাচা, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। বাড়িটা আপনি দশ দিনের মধ্যে ছাড়বেন।

কেন?

আবার বলছেন কেন? আপনি জানেন না কেন?

না, জানি না।

এই বাড়ি আমাদের।

কে বলেছে তোকে?

কি বলছেন আপনি? কে বলেছে মানে?

যা, একটা দলিল এনে আমাকে তুই দেখা যে এই বাড়ি তোর। যেদিন দেখাবি সেই দিনই ছেড়ে দেব। আর শোন বিজু, তোর মাথাটা বেশি গরম হয়ে আছে। মাথা এত গরম করিস না। এই বয়সে মাথা যদি এত গরম হয় তা হলে বাকি জীবনটা কি করবি?

আপনি দয়া করে উপদেশ দেবেন না। উপদেশের আমার দরকার নেই।

তা নেই। তোর যে জিনিসের দরকার সেটা হল জুতোর বাড়ি। নেংটা করে তোকে। জুতো দিয়ে পেটানো দরকার। আর মাথাটা কামিয়ে দেওয়া দরকার।

বিজু থমথমে মুখে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে যাবার সময় পিছনে-পিছনে তিথি আসছে। তিথি নরম গলায় বলল, বিজু ভাইয়া।

বিজু জবাব দিল না।

তিথি বলল, আমরা এই বাড়িতে থাকব না বিজু ভাইয়া। এই বাড়ি ছেড়ে দেব। সবাই মামার বাড়িতে চলে যাব। আগেই যেম, শুধু বাবা যেতে চাচ্ছে না বলে যাচ্ছি। না। বাবা

মামাদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেখলেই কেমন পাগলের মতো হয়ে যান। বিজু ভাইয়া, তুমি রাগারাগি করো না। আমরা থাকব না।

বিজু কোনো জবাব দিল না। তবে তিথি যে শান্ত-সহজ ভঙ্গিতে এতগুলো কথা বলতে পারল তাতে সে অবাক হল। ও সেদিনও পুঁচকে মেয়ে ছিল, আজ কেমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। বিজুর মনে হল বড় চাচার মেয়েগুলো বড়চাচা কিংবা বড় চাচির মতো খারাপ হয় নি। চেহারা ভালো না, কিন্তু মেয়েগুলো ভালো। বিশেষ করে তিথি। এর গলায় সে কোনোদিন একটা উঁচু স্বর শোনে নি। তিথির সঙ্গে সোমার কোথায় যেন মিল আছে।

সাইফুদ্দিন সাহেব আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন ভেবেছিলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না। কাল রাতে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর লাগছে। যেদিন সকাল সকাল ফিরবেন। ভাবেন সেদিনই ফেরা হয় না। ছ সাত জন রুগী বসে আছে। তাঁর জন্যে এতগুলো রুগী অপেক্ষা করবে এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। শেষ বয়সে পসার বাড়তে শুরু করল কি-না কে জানে! খারাপ সময়টা বোধহয় কেটে যাচ্ছে। দিনের পর দিন গিয়েছে একটা রুগী পান নি। কম্পাউন্ডারের যে কাজ ইনজেকশান দিয়ে দুটাকা নেওয়া সেই কাজও করতে হয়েছে। জীবনের শেষে এসে সুদিনের মুখ দেখছেন। ডাক্তার হিসাবে আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন, তা হলে রুগী আসছে কেন? বয়সের কারণে কি চেহারায় ডাক্তার ভাবটা বেশি এসেছে? হতে পারে। তাঁর মাথায় চুল লম্বা। সব চুল পেকে ধব ধব করছে বলে চেহারায় একটা ঋষি-ঋষি ভাব এসে গেছে।

তিনি পর্দা সরিয়ে ডাকলেন, এখন কে? আপনি? আসুন।

ছেলে কোলে নিয়ে মধ্যবয়সী এক লোক ঢুকল। ছেলের বয়স চার-পাঁচ। রোগা লিক-লিক করছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এর একমাত্র অসুখ অপুষ্টি।

থোকার কি হয়েছে?

পেটে ব্যথা। কাল সারা রাত ঘুমাতে দেয় নাই। ছটফট করছে।

ব্যথা কি এখনো আছে?

কিছু বলছে না।

কি খোকা, ব্যথা আছে?

ছেলে না সূচক মাথা নাড়ল। সাইফুদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, ব্যথা থাকলেও অনেক সময় ছেলেরা ডাক্তারের ভয়ে বলে, না।

ঠিক বলেছেন ডাক্তার সাহেব।

দেখি থোকাকে এখানে শুইয়ে দিন তো। কি খোকা, আমাকে ভয় লাগে?

খোকা হেসে ফেলল। দীর্ঘ সময় নিয়ে সাইফুদ্দিন সাহেব রুগীকে দেখলেন। তাঁর পসার বাড়ছে। তাঁকে আরো সাবধান হতে হবে। পসারের সাথে সাথে দায়িত্ব চলে আসে।

রুগী দেখে শেষ পর্যন্ত বেরুতে বেরুতে নটা বেজে গেল। এখান থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইলের মতো। এইটুকু পথ হেঁটে হেঁটে যান। এতে শরীরটা ঠিক থাকে। রাতে সুনিদ্রা হয়।

রাস্তায় নামতেই দেখলেন বিজু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, কি রে বিজু তুই।

তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। মেলা রুগী আসছে দেখি তোমার কাছে।

তিনি তৃপ্তির হাসি হাসলেন। বিজু বলল, রিকশা নেবে না হাঁটবে?

চল হাঁটি। তুই কিছু বলবি?

হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট থাকলে বিজর কথা বলতে সুবিধা হয়। তবে বাবার সঙ্গে তো আর সিগারেট হাতে কথা বলা যায় না। বিজু সিগারেট ফেলে দিল। আস্ত সিগারেট ফেলে দিতে মায়া লাগল। সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, সোমার ব্যাপারে কিছু বলবি?

না। আচ্ছা বাবা, দাদার মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পত্তির ভাগটাগগুলো কীভাবে হল।

সম্পত্তি আছেই বা কি আর ভাগই বা কি হবে।

তবু যা আছে সেটার কথাই বল।

কাগজপত্রে তো কিছু নাই, মুখে মুখে ভাগ।

বল কি?

কেন, কি হয়েছে?

বিজ জবাব দিল না। এক দলা থথ ফেলে মুখ বিকৃত করল। তার অনেক পরিকল্পনা মাথায়। এখন মনে হচ্ছে সব পরিকল্পনায় পানি লেগে গেছে। কোনো পরিকল্পনা কাজে লাগানো যাবে না। ঢাকা শহরের এমন সুন্দর একটা জায়গায় তাদের সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি। পুরনো বাড়িটা ভেঙে ব্যাংক লোন নিয়ে ছতলা দালান তোলা যায়। নিচের তলায় হবে ডিপার্টমেন্ট স্টোর, উপরে ফ্ল্যাট। একেক ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট, মোট দশটা ফ্ল্যাটে চার হাজার করে ভাড়া হিসাব করলেও হয় চল্লিশ হাজার। ডিপার্টমেন্ট স্টোর সে নিজে চালাবে। সব পাওয়া যাবে এখানে। একটা স্ন্যাকস কর্নার থাকবে। ভিডিও কর্নার থাকবে আজকাল ভিডিও ব্যবসা জমজমাট। লোকজন বাজার করতে এসে পছন্দসই একটা ক্যাসেট নিয়ে চলে যাবে।

বিজু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সাইফুদ্দিন সাহেব বললেন, কি হয়েছে রে বিজু?

বিজু এক দল থুথু ফেলল, জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। বড় গরম লাগছে। আজ আবার গরম পড়ে গেছে।

১২. প্যাকেট করা নতুন ক্যাসেট

প্যাকেট করা নতুন ক্যাসেট ডেক জোগাড় করতে কামালের বেশ ঝামেলা হয়েছে। তিন ঘন্টার জন্যে নিয়ে যাবে, প্যাকেট খোলা যাবে না-এই কথার পরও কোনো দোকানদার রাজি হয় না। এই তিন ঘন্টার জন্যে পাঁচ শ টাকা দিতে সে রাজি, তাতেও কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত সাত শ টাকায় রফা হল। ঠিক হল দোকানের এক জন কর্মচারীও সাথে যাবে। তাতেই সই। এত যন্ত্রণা করে শেষ পর্যন্ত একটা পয়সা না পাওয়া গেলে মাথায় বাড়ি।

দোকানের কর্মচারী যাবার পথে বলল, তিন ঘন্টার জন্যে জিনিসটা নিচ্ছেন কেন?

কামাল বিরক্ত হয়ে বলল, এত কথার আপনার দরকার কি? এই নেন পঞ্চাশটা টাকা রাখেন। চা-পানি খাবেন। আর দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখবেন।

ব্যাপরটা কি?

ব্যাপারটা কি না জিজ্ঞেস করার জন্যেই তো পঞ্চাশ টাকা। আবার বলেন ব্যাপারটা কি? বাড়ি কোথায় ভাই আপনার?

কর্মচারী চুপ করে গেল।

ক্যাসেট ডেক ভদ্রলোকের পছন্দ হল। মুখে সে কিছু বলল না তবে পছন্দ যে হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। চোখ চক চক করছে। চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপছে। কামাল মনে মনে বলল, হারামজাদা লোভী।

ভদ্রলোক বললেন, কত চান আপনি?

কামাল বলল, এর আসল দাম আপনি জানেন?

আপনি কত হলে দিতে পারেন শুনি।

পনের হাজার।

আপনি পাগল না-কি, ব্ল্যাক মার্কেটের জিনিস চাচ্ছেন পনের হাজার।

ব্ল্যাক মার্কেটের বলেই পনের চাচ্ছি—আসল দাম চল্লিশ।

আমি ছয় হাজার দিতে রাজি।

কত বললেন?

ছয়।

রাগে কামালের ব্রহ্মতাল জ্বলে গেল। হারামজাদা বলে কি?

রাজি থাকলে বলেন আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাশ।

এই দামাদামি কার কাছে শিখছেন ভাইসাব?

কি বললেন?

না বলব আবার কি?

ব্ল্যাক মার্কেট করছেন এইটাই তো অপরাধ তার ওপর আবার প্রফিট করার চেষ্টা।

তা তো ঠিকই।

আপনাকে তো পুলিশেও ধরিয়ে দিতে পারি। পারি না?

জ্বি পারেন। কেন পারবেন না?

সাড়ে ছয় পাবেন।

কামাল মধুর ভঙ্গিতে হাসল। ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে যান, সাত হাজার। ক্যাশ দিয়ে দিচ্ছি। রাজি থাকলে বলেন হ্যাঁ।

রাজি আছি। বিকালে আসব টাকা জোগাড় রাখবেন।

বিকালে আসতে হবে না এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আপনার লোককে বলুন ফিট করে দিক।

এটা তো দেওয়া যাবেনা। আরেক জনকে দেখাতে নিয়ে যাব। আমার তিনটা সেট আছে তিনটাই বেচতে হবে।

একই জিনিস?

জ্বি একই জিনিস। একই কোম্পানি। একই মাল।

ওদের কাছে কততে বেচবেন।

যত পাওয়া যায়। তবে সাত পর্যন্ত আসলে ছেড়ে দেব। বেশি লোভ করতে নাই।

আপনি নিজে কত দিয়ে কিনেছেন?

কামাল মধুর ভঙ্গিতে হাসল। ভদ্রলোক বললেন, এইটাই রেখে যান। অন্য সেট কাস্টমারদের দেখান।

অন্য দুই সেট আছে টঙ্গিতে। আবার টঙ্গি যাব? বিকেলে আমি নিয়ে আসব। জিনিস দেখে ফিট করে তারপর টাকা দিবেন। আমি ভাই এক কথার মানুষ।

কামাল সন্ধ্যার পর ঐ বাড়িতে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। কামালকে দেখেই উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, জিনিস কোথায় সেটা শুনি।

আপনার এখান থেকে গেলাম না? ভদ্রলোক জিনিস দেখে মুগ্ধ। এক কথায় বার হাজার দিতে রাজি। আমি তিনটাই খালাস করে দিলাম পঁয়ত্রিশ হাজারে।

সে কি?

তিনটাই কিনে নিলেন?

জ্বি। আমি ভাবলাম খবরটা আপনাকে দিয়ে যাই। বলে গিয়েছিলাম, অপেক্ষা করে আছেন।

এই খবরে আমার লাভটা কি? বার হাজার তো আমিও দিতে পারতাম।

আপনি তো ভাই দিতে চান নাই। আপনি বলেছেন সাত।

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বসে রইলেন। কামাল বলল, ভাইসাব মন খারাপ করবেন না, এই রকম চালান যদি আরো আসে আপনাকে খবর দিব। আমি আপনাকে কথা দিলাম যে দাম আপনার সাথে ঠিক হয়েছে ঐ দামেই দিব। সাত হাজার। আমি এক কথার মানুষ।

কবে আসবে এরকম চালান?

তার কি ভাই কোনো ঠিক আছে? কালও আসতে পারে, আবার ধরেন দুই মাসও লাগতে পারে। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি আসামাত্র আপনাকে টেলিফোন করব। আমি এক কথার মানুষ।

ভদ্রলোক মন খারাপ করে বসে রইলেন। কামাল হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে এল। হারামজাদা টোপ গিলেছে। এখন টেলিফোন করলেই পকেটে টাকা নিয়ে ছুটে আসবে। টঙ্গি আসতে বললে টঙ্গি আসবে। জয়দেবপুর যেতে বললে যাবে জয়দেবপুর। তবে টেলিফোন করতে হবে

মাস খানেক পরে। দু এক দিনের মধ্যে করলে সন্দেহ করতে পারে। লোভ, লোভ। শালা ললাভের জন্যে মারা পড়ছিস। লোভটা একটু কমা। একটু না-কমালে ধনে প্রাণে যাবি।

১৩. বিজু মুরাদকে ধরে এনেছে

বিজু মুরাদকে ধরে এনেছে।

কলেজে যাওয়ার পথে সে মুরাদকে প্রথম এক ঝলক দেখতে পায়। সে আমজাদের চায়ের দোকানে বসেছিল। বিজুকে দেখেই চট করে সরে পড়ল। বেশি দূর যেতে পারল না। বিজু ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল, পর মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক চড় বসাল। এমন প্রচণ্ড চড় যে, মুরাদ উলটে পড়ে মাথায় চোট খেল। এক ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, করেন কি?

বিজু বলল, কি করছি দেখতে পাচ্ছেন না, আর দিচ্ছি। আপনার বাসা থেকে টাকা নিয়ে পালালে আপনি কি করতেন? কোলে নিয়ে চুমু খেতেন? কি চুমু খেতেন কোলে নিয়ে?

ভদ্রলোক কথা বললেন না। বিজু মুরাদের চুল ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে এল। তার মূর্তি ভয়ঙ্কর। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাঝে-মাঝে হিংস্র গলায় বলছে, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। এত বড় সাহস। বাজারের টাকা নিয়ে উধাও। মামদোবাজি?

সোমা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। এক জন মানুষ অন্য এক জনকে এমনভাবে মারতে পারে? সোমা বলল, এই সব কী হচ্ছে?

বিজু বলল, আদর হচ্ছে। হারামজাদাকে আদর করছি।

সোমা কড়া গলায় বলল, ছাড়—ওর চুল ছাড়।

তুমি এখান থেকে যাও তো আপা।

তুই ওর চুল ছাড়।

বললাম তো–তমি এখান থেকে যাও।

ওকে ছেড়ে দে বিজু।

তুমি বড় যন্ত্রণা করছ আপা।

তুই ওকে না ছাড়লে আমি এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

বিজু চুল ছেড়ে ছিল। সোমা বলল, তুই এসব কী শুরু করেছিস?

চোরকে ধরে কয়েকটা চড় দিয়েছি, এর বেশি কী করলাম?

বড় চাচাকে তুই কী বলেছিস?

বড় চাচার কথা এখানে আসছে কেন?

তুই কী বলেছিস বড় চাচাকে?

কী বলব, কিছুই বলি নি।

কিছুই বলিস নি তা হলে উনি এরকম করছেন কেন?

কীরকম করছেন?

তাও জানিস না?

তুমি বড় চেঁচামেচি করছ আপা। এত চেঁচামেচি করার তো কিছু হয় নি, তুমি অনেক কিছু করছ যা আমার পছন্দ না। কিন্তু কই আমি তো চেঁচামেচি করছি না। আমি তো চুপ করে আছি।

সোমাচাপা স্বরে বলল, আমি কী করেছি?

ঐ হারামজাদা প্রফেসরের বাসায় তুমি যাও নি? এত কিছুর পরও তো গিয়েছ। হেসে হেসে গল্পগুজব করেছ। কর নি?

জাহানারা বের হয়ে এলেন। কঠিন স্বরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। বিজু ঘরে যা।

বিজু ঘরে ঢুকে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল, চা দে তো ঊর্মি। আজ ক্লাসটা মিস হয়ে গেল। ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ছিল। তুই কলেজে যাস নি কেন রে?

কলেজ বন্ধ।

আজ আবার কীসের বন্ধ? যন্ত্রণা হল দেখি। দুই দিন পর পর বন্ধ? তোদর কলেজের অবস্থা তো দেখি আমাদেরটার চেয়েও খারাপ।

বিজু সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। একটু আগের ঘটনার কোনো ছাপ তার মধ্যে নেই। আবার কলেজের দিকে রওনা হবার আগে সে সোমাকে বলল, আপা, তোমার টবের এই গাছ দুটা চমৎকার। বগনভিলিয়ার এত সুন্দর কালার হয় জানাই ছিল না। একসেলেন্ট।

সোমা জবাব দিল না।

বিজু নিচু গলায় বলল, মাঝে-মাঝে হট ব্রেইনে কি বলে ফেলি কিছু মনে রেখ। না আপা। আর ঐ পিচ্চিকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিয়েছি। দেখ গিয়ে ও দাঁত বের করে হাসছে। মারধরে ওদের কিছু হয় না। মারধর ওদের ডাল ভাত।

দুপুরে সোমা বড় চাচাকে দেখতে গেল। তিথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবার বোধহয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আপা। ঐদিন বিজু ভাই কি-সব বলে গেছেন। তারপর থেকে......

সোমা বলল, চাচি নেই?

মা সাত দিন আগে রাগারাগি করে ঐ যে বড় মামার বাসায় গেছেন আর আসছেন না। কী করি বল তো আপা?

বড় চাচার অবস্থার কথা চাচি জানেন?

জানেন। আমি নিজে গিয়ে বলেছি।

চাচি কী বললেন?

সূচিপত্র

কিছুই বলেন না।

সোমা বড় চাচার ঘরে ঢুকল। তিনি একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কে, সোমা না?

জ্বি।

ভালো আছিস মা?

জ্বি ভালোই তো?

শরীরটা ভালো তো?

জ্বি ভালো।

শরীরটা ঠিক রাখবি। শরীর ঠিক রাখাটা খুবই দরকার। শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে—তাই আমার এই অবস্থা। শরীর ঠিক থাকলে তিথির তিন মামাকে কি করতাম দেখতে পেতিস। ধরে ধরে আছাড় দিতাম। তিনটাই বদ। মহা বদ। দুটো কাঁচাপয়সার মুখ দেখে মনে করছে দুনিয়া কিনে ফেলেছে। দুনিয়া কেনা এত সস্তা না। ফেরাউন বাদশা কিনতে পারে নি। তার তো টাকার অভাব ছিল না। ব্যাটা তোদের কটা টাকা হয়েছে বল দেখি? দুটো ব্যাঙের আধুলি পেয়ে মনে করেছিস কি? তোদের মুখে আমি পেচ্ছাব করে দিইইয়েস পেচ্ছাব। স্ট্রেট পেচ্ছাব করে দেব। তখন বুঝবি কত ধানে। কত চাল? তোরা ভেবেছিস

কী? দুই মণ ধানে দুই মণ চাল? উঁহু, এত সহজ না। দুই মণ ধানে এক মণ চাল–খুব বেশি হলে দেড় মণ......

বড় চাচা অনবরত কথা বলে যাচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও থামছেন না। তিথি ও মিথি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মিথি হাত ইশারা করে সোমাকে ডাকছে।

সোমা উঠে গেল বড় চাচার কথা বলা বন্ধ হল না। তিনি কথা বলেই যাচ্ছেন। মিথি বলল, কি করব আপি?

বড় চাচিকে নিয়ে আয়। কিংবা তোর কোনো মামাকে আন। ভয় নেই আমি এখানে আছি।

বাবা কি পাগল হয়ে গেছেন?

আরে না, মানুষ এত সহজে পাগল হয় না। মাথাটা গরম হয়েছে। ওষুধপত্র খেলে ঠিক হয়ে যাবে। যা তোরা দুজনে মিলে চলে যা।

মিথিরা চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় চাচা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বেশ আরামের ঘুম। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

সোমা পাশেই বসে রইল। তার কিছুই করার নেই। একটা বই হাতের কাছে থাকলে বসে বসে পড়া যেত। অনেক দিন বই পড়া হয় না। বই পড়তে কেমন লাগবে এখন কে জানে।

বিকেলের দিকে একবার কি যাবে বই আনতে? না থাক। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই। এমনিতেই অনেক যন্ত্রণা।

সোমার বড় চাচি তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে ফিরলেন। বড় চাচা তখনো ঘুমে। সোমা নিজের ঘরে চলে এল। ঘুমন্ত মানুষের পাশে থেকে থেকে তারও ঘুম পাচ্ছে। সারা দিন সে কিছুই করে নি। তবুখুব ক্লান্ত লাগছে। সে খানিকক্ষণ ঘুমুবে। ঊর্মিকে বলে দেবে তাকে যেন ডাকা না হয়। রাতের খাবার সময়ও যদি দেখা যায় তার ঘুম ভাঙে নি তবু যেন ডাকা না হয়। এক রাত না খেলে কিছু হয় না।

সোমা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে বলতে পারবে না, তার কাছে মনে হল শুধু তার চোখ একটু লেগেছে ওমনি যেন ঊর্মি এসে তার গা ঝাঁকাচ্ছে, আপা ওঠ তো। প্লিজ ওঠ।

সোমা বিরক্ত গলায় বলল, তোকে কী বলেছিলাম?

আপা ওঠ, দরকার আছে। প্লিজ।

সোমা উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় বাতিও জ্বালানো হয় নি। দরজা-জানালা লাগানো।

তুমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছ আপা। এখন সাড়ে নটা বাজে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। তবে তোমাকে ঘুম থেকে তুলেছি অন্য কারণে। প্রফেসর সাহেব এসেছেন।

কে এসেছেন?

প্রফেসর সাহেব। ঐ যে দোতলা বাড়ির। সন্ধ্যার পর পর এসেছেন। আর যেতে চাচ্ছেন না। আমি এতক্ষণ গল্প করলাম। গল্প আমার পেটে যা ছিল সব শেষ। তিনিও চুপচাপ বসে। আমিও চুপচাপ। আপা হাত মুখে একটু পানি দিয়ে চলে এস।

সোমা কখনো ভাবে নি যে, সে বসার ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। যেন সোমা এক জন খুব সম্মানিত মহিলা। সোমার ভীষণ লজ্জা লাগল।

সে নিচু গলায় বলল, আপনি বসুন।

ঊর্মি বলছিল, তোমার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে ঘুমুবার সময় বলে গেছ-তোমাকে যেন ডাকা না হয়। আমি তাই অপেক্ষা করছিলাম।

সোমা কি বলবে ভেবে পেল না। বসার ঘরের অবস্থা কি হয়ে আছে। উনি আসবেন জানলে সে ঘর গুছিয়ে রাখত।

প্রফেসর সাহেব নরম গলায় বললেন, তোমার ঘোটবোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব হাসছিলাম। ও যে এত মজার মজার গল্প জানে—আশ্চর্য। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করতে পারে না। কিন্তু ও দেখলাম সুন্দর রসিকতা করে।

আপনাকে কি ও চা দিয়েছে?

হ্যাঁ তিন বার দিয়েছে। আর চা খাব না, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে চলে যাব।

বলুন।

তুমি এত দূরে বসেছ কথা বলতে হলে তো চেচিয়ে বলতে হবে। কাছে এস।

সোমা এগিয়ে এল।

নিজেদের বাড়িতে তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন বল তো?

লজ্জা পাচ্ছি না।

আমি যে জন্যে এসেছি সেটা বলে চলে যাই। তুমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছ। তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আচ্ছা শোন, ঐ দিন যে তুমি আমার বাসায় গিয়েছিলে তা নিয়ে কি কোন সমস্যা হয়েছে?

না। সমস্যা হবে কেন?

গত কাল সন্ধ্যায় তোমার বাবা আমার বাসায় এসেছিলেন। কাজেই মনে হল হয়তো কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। তোমার বাবাকে সেটা বুঝিয়ে বললাম।

বাবা আপনার কাছে গিয়েছিলেন?

তুমি জান না?

না।

হ্যাঁ গিয়েছিলেন। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। তোমার আগের হাজব্যান্ড না-কি খুব বিরক্ত করছে তোমাকে?

না তো।

তোমার বাবা তোতাই বললেন। রাত দশটা-এগারটার দিকে বাসার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। ক্রিমিনাল নেচারের মানুষ, তাই তোমার বাবা ভয় পাচ্ছেন। যদি কোনো ক্ষতিটতি করার চেষ্টা করে।

ও কোনো ক্ষতিটতি করার চেষ্টা করবে না।

না করলে তো ভালোই। তোমার বাবাকে সেই কথা বললাম। এবং আরো একটা কথা বললাম; সেই কথাটা তোমাকেও বলা দরকার। কথা ঠিক না, এক ধরনের আবেদন বলতে পার। আমি তোমার বাবাকে বলেছি যে, আপনার বড় কন্যাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার জীবনের ভয়াবহ দুর্যোগের জন্যে আমি পরোক্ষভাবে হলেও দায়ী, কাজেই.......

সোমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, আমার মনে হল তোমার বাবা আমার কথা শুনে খুশিই হয়েছেন। ওঁর খুশি হওয়াটা তেমন জরুরি নয়, তুমি খুশি

কি না বা তুমি কী ভাবছ সেটা হচ্ছে জরুরি। জীবন নতুন করে শুরু করা অন্যায় কিছু না। পিছন দিকে তাকিয়ে বড় বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার কোনো মানে হয় না। আজ উঠি। ভালো কথা, তোমার জন্যে দুটো বই এনেছি।

সোমা তাঁকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। ভদ্রলোক চলে যাবার পরও সে অনেকক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বড় চাচার কথা শোনা যাচ্ছে—এক নাগাড়ে তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। এখন কথা বলছেন আগের চেয়েও অনেক উঁচু গলায়।

সমস্যা আবার কী? কীসের সমস্যা? কার বাপের সমস্যা? কাকে আমি ডরাই? কোন ব্যাটাকে ডরাই? তারা আমাকে কী ভাবে? এখনো হাতে এমন জোর আছে যে, একটা চড় দিলে দ্বিতীয় চড় দেওয়া যাবে না। এক চড়েই পাউরুটি বিস্কুট হয়ে যাবে.....

বড় চাচা কথা বলছেন। আরেক জন কে যেন কাঁদছে। কে কাঁদছে বোঝা যাচ্ছে না—মিথি, তিথি না বড় চাচি? সব পুরুষের কান্নার শব্দ যেমন এক রকম, সব মেয়েদের কান্নার শব্দও এক। কে জানে যখন মানুষ কাঁদে তখন বোধহয় সবাই সমান হয়ে যায়।

সোমা দেখল বাবা আসছেন। হেঁটে হেঁটে আসছেন। আজকাল প্রায় রাতেই উনি দেরি করে ফিরছেন। পসার বোধহয় বাড়ছে। আগের বিমর্ষ ভাব এখন আর তাঁর মধ্যে নেই।

কে, সোমা?

জ্বি বাবা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে মা?

তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এত দেরি কেন?

একটা কলে গিয়েছিলাম। ওরা আবার চা-টা খাইয়ে দিল।

নামি ডাক্তার হয়ে যাচ্ছ মনে হয় বাবা।

বাবা হাসলেন। সোমা অবাক হয়ে লক্ষ করল—এই যে বড় চাচা চেঁচামেচি করছেন বাবার কানে তা যাচ্ছে না। তিনি হাসতে হাসতে কথা বলছেন।

এখানে তো বেশ বাতাস সোমা।

জ্বি।

দাঁড়াই খানিকটা গায়ের ঘাম মরুক, কী বলিস?

দাঁড়াও।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, তোকে একটা কথা বলা হয় নি। প্রফেসর সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। মানে এমনি হঠাৎ ভাবলাম....হাজার হলেও প্রতিবেশী। তাই না?

তা তো ঠিকই।

ভদ্রলোককে যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম না। খুবই ভদ্রলোক। ধরতে গেলে আমি তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। তোর মাকে বলেছি সেকথা। খুবই ভালো মানুষ। পাড়াতেও খুবই সুনাম।

ভালো মানুষ, সুনাম কেন হবে না বল?

নিরহঙ্কারী লোক। এক দিন পানি ছিল না, উনি নিজেই রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির কল থেকে বালতি করে পানি নিয়ে গেলেন। সবাই পারে না। সঙ্কোচ বোধ করে। তাই না?

তা ঠিক।

সম্মান যার আছে সে সম্মান যাওয়ার ভয় করে না। যার সম্মান নেই তার যত ভয়।

তোমার গায়ের ঘাম বোধহয় মরেছে, চল ভেতরে যাই।

দাঁড়া আরেকটু। বাতাসটা ভালোই লাগছে। সোমা, প্রফেসর সাহেব একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, মানে—ইয়ে—তোর মা কি কিছু বলেছে তোতাকে?

না।

আচ্ছা তোর মার কাছ থেকে শুনিস। প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়েছে। একটা ফ্রেশ স্টার্ট হলে ভালো হয়। বেশ ভালো হয়। চেঁচামেচি কে করছে রে?

বড় চাচা।

যন্ত্রণা হল দেখি।

সাইফুদ্দিন সাহেব বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে ফেললেন।

রাত বারটা দশ। বিজু এখনো ফেরে নি। মাঝেমাঝে সে খুব রাত করে। তার না কি পার্টি মিটিং থাকে। আজও বোধহয় পার্টি মিটিং ছিল। জাহানারা ভাত বেড়ে ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

সোমা বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড় মা। আমি জেগে আছি। আমি সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়েছি। এখন আর ঘুম আসছে না।

জাহানারা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমুতে গেলেন। বাড়ি নিঝুম হয়ে গেল। বড় চাচার কথাও শোনা যাচ্ছে না। সম্ভবত তিনিও ঘুমুচ্ছেন। মাঝেমাঝে একটা ঘুমন্ত বাড়িতে একা একা জেগে থাকতে ভালো লাগে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব চিন্তা আসে। আজ অবশ্যি তেমন কোনো অদ্ভুত চিন্তা সোমার মাথায় আসছে না। সে প্রফেসর সাহেবের রেখে যাওয়া বইটি কোলে নিয়ে বসে আছে।

এই ভদ্রলোককে সে কখনো কোনো নামে ডাকে নি। প্রথম পরিচয়ের দিন এক বার শুধু স্যার বলেছিল। উনি বলেছিলেন, সবার মুখে দিনরাত স্যার-স্যার শুনি। তুমি স্যার না বললে কেমন হয়?

সোমা বলেছিল, কী ডাকব?

তোমার যা ইচ্ছা তাই ডাকতে পার।

সোমা কিছু ডাকে নি।

দরজার কড়া নড়ছে। সোমা খুলে দিল। লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল বিজু।

দেরি করলাম আপা। সরি। পার্টি মিটিং ছিল।

তরকারি গরম করব, না যেমন আছে তেমনি খাবি?

কিছু খাব না আপা। বিরিয়ানি খেয়ে এসেছি।

চা খাবি? চা করে দেব?

দাও। বেশি করে বানিও। ফ্লাস্কে ভরে রাখব।

সোমা রান্নাঘরে চা বানাচ্ছে। বিজু কাপড় ছেড়ে সিগারেট হাতে এসে বসল ববানের পাশে।

সোমা চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, বিজু, ও নাকি রাতের বেলা বাসার সামনে দিয়ে হাঁটা হাঁটি করে?

কে বলেছে তোমাকে?

করে কি না বল।

আর করবে না। হেভি ধাঁতানি দিয়ে দিয়েছি।

মারধর করেছিস?

আরে না। তুমি কি ভাবো আমি রাতদিন মারামারি করে বেড়াই? আমি লোকটাকে কঠিন করে বলে দিয়েছি—আপনাকে তিন রাত এখানে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছি। আর যেন না দেখি। মামদোবাজি আমি সহ্য করব না।

সোমা শীতল গলায় বলল, এক জন লোক যদি বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তা হলে তোর অসুবিধা কী?

বিজু খুব অবাক হল।

সোমা বলল, এমন তো না যে সে কারোর কোনো ক্ষতি করছে।

ও একটা ক্রিমিন্যাল লোক আপা। বল, ক্রিমন্যাল না?

সোমা চুপ করে রইল।

বিজু বলল, একটা কথা সত্যি করে বল তো আপা, তুমি ওর কাছে ফিরে যেতে চাও?

না।

কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে, চলে এসে তুমি ভুল করেছ?

না।

শুনে ভালো লাগল আপা। তোমার কাণ্ডকারখানায় মাঝে-মাঝে কনফিউজড হয়ে যাই।

সোমা বলল, তুই যখন ঐ সব কথা ওকে বললি, তখনও ও কী বলল?

তুমি এখনো ও সব নিয়ে ভাবছ?

কী বলল ও?

কিছুই বলে নি।

এখানে আসত কেন, জিজ্ঞেস করেছিলি?

না। কথা বলার অবস্থা ছিল না।

কেন?

মাথায় ব্যাভেজফ্যাভেজ দেখলাম। কেউ বোধহয় হেভি পিটন দিয়েছে।

সোমার হাত থেকে চা ছলকে পড়ল।

বিজু বলল, ঠাট্টা করছিলাম আপা। তোমার রিঅ্যাকশন দেখছিলাম। লোকটা বহাল তবিয়েতেই আছে। তবে মার একদিন সে খাবে। পাবলিক তাকে পিটিয়ে লম্বা বানাবে। তোমার শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি।

সোমা উঠে দাঁড়াল।

বিজুও উঠল। সোমার পিছনে পিছন আসতে আসতে বলল, তুমি খুব শক্ত মেয়ে, তবে তোমার আরো শক্ত হওয়া দরকার।

তোকে উপদেশ দিতে হবে না।

উপদেশ দিচ্ছি না আপা; আর শুধু একটা কথা বলব। তোমার ঐ প্রফেসর ভদ্রলোক-খারাপ না। ভালো। তুমি যদি এঁর বাসায় যাও, আমি রাগ করব না। বরং খুশিই হব। শুধু আমি একা না, এ-বাড়ির সবাই খুশি হবে।

১৪. বড় চাচাকে নিয়ে যেতে

বড় চাচাকে নিয়ে যেতে মিথির দুই মামা এসেছেন।

বাড়ির সামনে একটা পিকআপ এবং একটা ডাইহাট গাড়ি দাঁড়িয়ে। পিকআপে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। ব্যাপারটা ঊর্মি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল। তার খুব খারাপ লাগল। সে ভেতরে এসে বিজুকে বলল, ওরা সবকিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিজু বলল, যাক না। তোর এত মাথাব্যথা কীসের?

মিথি-তিথিরা খুব কান্নাকাটি করছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখার কোন দরকার নেই। বড় আপা কোথায়?

ঐ বাড়িতে।

যা, আপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ঊর্মি বলল, আমি পারব না। এইরকম কান্নাকাটির মধ্যে আমি যাব নাকি?

বড় চাচা ভীষণ হৈ চৈ করছেন। তিনি কিছুতেই যাবেন না। ক্রমাগত বলছেন—ওরা আমাকে নিয়ে মেরে ফেলবে। খুনীর দল আমাকে নিয়ে মেরে ফেলবে। আমাকে নিয়ে খুন করবে। খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে।

মিথির দুই মামা খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। গাড়ির দুই ড্রাইভার তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তিনি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন। তাঁকে ঘর থেকে বের করতে ড্রাইভার দু জনকে খুব বেগ পেতে হল।

মিথির বড় মামা বিরক্ত গলায় বললেন, এই সামান্য কাজে তোমরা সারা দিন লাগিয়ে দিচ্ছ। হাত দুটা শক্ত করে ধর না কেন?

বাড়ি থেকে বের করে আনার পর বড় চাচা কিছুক্ষণের জন্যে চিৎকার করলেন। তারপর শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। বিজুকে ডাকতে শুরু করলেন, ও বিজু, বিজুওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ও বিজু,-বিজু.....। আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিজু.......ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

মিথির ছোট মামা বললেন, এক জন কেউ মুখটা চেপে ধর। চিৎকার সহ্য করা যাচ্ছে না। আহ, কি—যে যন্ত্রণা।

বড় চাচাকে পিকআপে ওঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ড্রাইভার দু জন পেরে উঠছে না। সাহায্যের জন্যে মিথির বড় মামা এগিয়ে গেলেন। বড় চাচা ফুঁপিয়ে ডাকতে লাগলেন, ও বিজু, বিজু.......

বিজু বেরিয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বড় চাচার দিকে। তারপর গর্জন করে উঠল, একটা মানুষ যেতে চাচ্ছে না, তারপরও আপনারা তাঁকে জোর করে নিয়ে যাবেন? পেয়েছেন কী আপনারা? মগের মুলুক নাকি?

বড় চাচা কান্না থামিয়ে উঁচু গলায় বললেন, ঘুষি মেরে ওদের নাক ফাঁটিয়ে দে বিজু। কথায় কাজ হবে না। কথার মানুষ এরা না।

বিজু বলল, যান, রেখে আসুন।

মিথির বড় মামা বললেন, কি বলছ তুমি? চিকিৎসা করাতে হবে না? এখানে চিকিৎসাটা কে করবে?

আমরা করব। আমরা কি পানিতে ভেসে গেছি নাকি? একটা লোক ভয় পাচ্ছে, যেতে চাচ্ছে না, তবু তাকে নিয়ে যাবেন। পেয়েছেনটা কী?

বড় চাচা বললেন, খামাখা কথা বলে সময় নষ্ট করছিস বিজু। ঘুষি দিয়ে নাক। ফাটিয়ে দে। এরা কথার মানুষ না।

বিজু বলল, যান রেখে আসুন। নইলে অসুবিধা হবে। পাড়ার লোক ডেকে থোলাই দিয়ে দেব।

বড় চাচা আনন্দে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, দেরি করিস না, ধোলাই দিয়ে দে। রাম থোলাই দিয়ে দে।

বড় চাচাকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিথি মিথিরা গাড়িতে উঠে বসেছিল, তারা নেমে আসছে। মালপত্র নামানো হচ্ছে। ঊর্মি বারান্দায় আছে।

বিজু একদিন ইলেকট্রিশিয়ানের সামনে তার গালে চড় মেরেছিল—এই অপরাধের জন্যে কোনোদিন সে বিজুকে ক্ষমা করবে না বলে ভেবে রেখেছিল। আজ ক্ষমা করল। সে এগিয়ে গেল জিনিসপত্র নামানোর কাজে বিজুকে সাহায্য করবার জন্যে। বড় চাচা এখন বেশ স্বাভাবিক। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে চেচিয়ে বলছেন, কাচের জিনিস আছে। আস্তে নামা! এরা কোন একটা কাজ যদি ঠিকমতো করতে পারে। বিজু উর্মিটাকে একটা ধমক দে তো—কি রকম টানাটানি করছে। ভাঙবে না?

১৫. সোমা নতুন বই নিতে এসেছে

সোমা নতুন বই নিতে এসেছে। তিনি বই বেছে দিচ্ছেন। সোমা দেখল একটা কুচকুচে কালো বিড়াল তাঁর পায়ে গা ঘষছে।

সোমা বলল, এই বিড়ালটা কি আপনার?

না। বেড়াল আমার পছন্দের প্রাণী না। তবে আমার স্ত্রী পছন্দ করত। বেড়ালকে খেতেটেতে দিত। এই কালো বেড়ালটা হচ্ছে আমার স্ত্রীর পোষা বেড়ালগুলোর কোনো একটা বংশধর।

আপনি কি একে খেতেটেতে দেন?

হ্যাঁ দিই। আমার স্ত্রীর প্রতি মমতা থেকে দিই। এমনিতে কিন্তু কুকুর-বেড়াল কোনোটাই আমি পছন্দ করি না।

আমিও করি না।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, লোকে বলে যারা পাখি পছন্দ করে তারা পশু পছন্দ করে না। তুমি কি পাখি পছন্দ কর সোমা?

জানি না, করি বোধহয়।

আজ এই বইটা নিয়ে যাও, প্রথম এক শ পাতা কষ্ট করে পড়তে হবে তারপর দেখবে– হাত থেকে বই নামাতে পারছ না।

সোমা জবাব দিল না। সে কালো বিড়ালটার দিকে একদৃষ্টিতে কি যেন দেখছে। সোমা চাপা গলায় বলল, ও বিড়াল খুব পছন্দ করে। বলেই সে অসম্ভব লজ্জা পেয়ে গেল।

তিনি অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। নরম স্বরে বললেন, উনি বেড়াল পছন্দ করতেন?

জ্বি। এক বার রাস্তা থেকে একটা বিড়াল ধরে নিয়ে এসেছিল। পিঠে ঘা হয়েছিল, তাই রোজ ডেটল দিয়ে ঘা ধুয়ে দিত। পুঁজ পরিষ্কার করত। আমার গা ঘিন ঘিন করত। ভাত খেতে পারতাম না। বিড়ালটা অবশ্যি বাঁচে নি। সাত দিনের দিন মরে গেল।

উনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন মনে হয়।

হ্যাঁ, হাউমাউ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। তার পরপরই অবশ্যি খুব স্বাভাবিক। ওর কষ্ট বেশিক্ষণ থাকে না।

সোমা?

জ্বি।

তুমি কিন্তু এখনো ঐ ভদ্রলোককে খুব পছন্দ কর।

সোমা চুপ করে রইল।

তিনি নরম স্বরে বললেন, এস আমরা বাইরে খানিকক্ষণ বসি।

তারা বারান্দায় এসে বসল। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সহজ গলায় বললেন, সোমা, আমার মনে হয় তোমার ঐ ভদ্রলোকের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত।

সে কেমন মানুষ আপনি কিছুই জানেন না বলে এটা বলতে পারলেন।

ধরে নিলাম খুবই খারাপ মানুষ। কিন্তু তুমি তাকে বদলাবার কোনো চেষ্টা কি করেছ? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি কর নি। করে দেখ না।

সোমা তাকিয়ে আছে কোনো কথা বলছে না।

তিনি বললেন, চা খাবে?

সোমা বলল, না।

তিনি ভারি গলায় বললেন, তোমাকে ওঁর কাছে ফিরে যেতে বলছি কেন জান, ঐ মানুষটার জন্যে তোমার তীব্র ভালবাসা আছে, কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে পারছ না।

আমি যা বুঝতে পারি নি—আপনি কী করে তা বুঝে ফেললেন?

বেড়াল তুমি পছন্দ কর না, কিন্তু গভীর মমতায় তুমি কালো বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলে। কারণ, তোমার খুবই প্রিয় এক জন বেড়াল পছন্দ করে।

সোমার চোখে পানি এসে গেল।

তিনি বললেন, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবে? রান্নাঘরে সবই হাতের কাছে আছে।

সোমাচা বানানোর জন্যে উঠে দাঁড়াল।

১৬. সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

কামাল এখনো বিছানায়। দুপুরে ঘুমিয়েছিল, বিকেলে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। এই সময়টা তার খুব খারাপ যায়। গলা ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। আজও কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

বিড়ালের বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটেছে। সব কটা এখন বিছানায়। বালিশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। কি সুন্দর দৃশ্য। কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে। দেখানোর কেউ নেই।

কামালের বুক হু-হু করে।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছে না। মাঝে-মাঝে কিছুই করতে মন চায় না।

আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। মনে হয় ঢালা বর্ষণ হবে। একটু একটু বৃষ্টি বোধহয় হচ্ছেও। ঝির ঝির শব্দ কানে আসছে। একটা বিড়াল কামালের বুড়ো আঙুল কামড়াবার চেষ্টা করছে। কামাল বলল, তোরা কিন্তু বড় বেশি বিরক্ত করছি। লাথি খাবি।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ল।

কামাল বলল, কে?

কেউ জবাব দিল না। আবার মদ টোকা পড়ল।

কামাল দরজা খুলে তাকিয়ে রইল। সোমা দাঁড়িয়ে।

সোমা বলল, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে কী হয়েছি, দেখ না।

কামাল বলল, তুমি কেমন আছ সোমা?

বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠল। সন্ধ্যাবেলার এই সময়টা ভালো না। এই সময় মানুষ বড় একাকী বোধ করে। তাদের বুক হু হু করে। অকারণেই তাদের চোখ ভিজে ওঠে। সন্ধ্যাবেলার এই অদ্ভুত সময়টাতে প্রিয়জনদের কাছে যেতে নেই। তবু সব মানুষই প্রিয়জনদের কাছে যাবার জন্যে এই সময়টাই বেছে নেয়। কেন বেছে নেয় কে জানে!